প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে ডিপ্লোমা স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে ডিপ্লোমা মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলেছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্যা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক— অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, 2014

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

পাঠক্রম

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা— মন্তেসরী (ডিপ্লোমা)

পঞ্চম পত্র

রচনা

অধ্যাপক দুলাল মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পত্র

রচনা

পর্যায়–ক □ শ্রীমতি শিপ্রা রাহা

পর্যায়–খ □ ডঃ বন্দনা দাস এবং অধ্যাপিকা অনিমা বাড়ৈ

ঘোষণা

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা— মন্তেসরী
(ডিপ্লোমা পাঠক্রম)

পঞ্চম পত্র

পর্যায়–১

একক ১ ❑ মূল্যায়ন 9-30

একক ২ ❑ নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের ধারণা 31-43

একক ৩ ❑ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন 44-65

একক ৪ ❑ প্রাথমিক শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের টুল এবং কৌশল 66-76

পর্যায়–২

একক ৫ ❑ পরিবেশ 77-104

একক ৬ ❑ শিশুর পরিবেশ 105-123

একক ৭ ❑ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যশিক্ষা 124-137

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায়–২ (প্রথম অর্ধ)

Unit 1 ❑ Social and Cultural Activities 141-142

(দ্বিতীয় অর্ধ)

একক ১ ❑ Simulated Teaching 143-159

একক ২ ❑ শিশু পরিবেশে পাঠ পরিকল্পনা 160-167

পত্র - ৫

একক ১ ❑ মূল্যায়ন (Evaluation)

গঠন

১.১ ভূমিকা **(Introduction)**

১.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১.৩ মূল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস এবং বিভিন্ন রিপোর্ট ও সুপারিশ ঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা **(Historical Development of Evaluation and Various Reports and Recommendations : A synoptic view.)**

১.৪ মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি **(Meaning, Nature and scope of Evaluation)**

১.৫ শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন **(Evaluation and Measurement in Education)**

১.৬ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন **(Examination and Evaluation)**

১.৭ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান **(Place of Evaluation in Pre-primary Education)**

১.৮ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

১.৯ অনুশীলনী **(Exercises)**

১.১০ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints to check your progress)**

১.১ ভূমিকা

এই এককটি এই পত্রের প্রথম অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আমরা মূল্যায়ন সম্পর্কে জানব। এই অধ্যায়টি নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণ সম্পর্কে আলোচনার প্রাথমিক স্তর।

এই অধ্যায়ে প্রথমে আমরা আলোচনা করব মূল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস। মূল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আমরা বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এ সম্পর্কে তথ্য পাই।

১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে তিনটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) শুধুমাত্র পরীক্ষা নেওয়া ছাড়াও অন্যসব দিক দেখার জন্য সুপারিশ করা হয়।

কোঠারী কমিশনের (১৯৬৪) সুপারিশে মূল্যায়ন ব্যবস্থার কথা বলা হয়।

অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) ঘোষণায় পরীক্ষা সংস্কারের জন্য মূল্যায়নের কথা পুনরায় বলা হয়।

এই এককের এর পরের অংশে আলোচনা করা হয়েছে মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি। এখানে আমরা জানব শিক্ষা এবং মূল্যায়ন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মূল্যায়নের পরিধি অনেকটাই ব্যাপক। কারণ মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য পূরণের যাচাই করা যায়, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ যাচাই করা যায়, তাদের ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেওয়া যায়, শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়া যায় ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আমরা এখানে জানব যে পরিমাপ এবং মূল্যয়নের মধ্যে কিছু মিল থাকলেও পার্থক্যই বেশী।

এই অধ্যায়ের শেষ অংশে আলোচনা করা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের গুরুত্ব। এই অংশে মূল্যায়ন শিক্ষায় কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয় তা আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি শেষ করার পরে আপনি—

- মুল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস জানতে পারবেন;
- মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি জানতে, বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারবেন;
- পরীক্ষা এবং মুল্যায়নের সম্পর্ক এবং পার্থক্য করতে পারবেন;
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান নির্ধারণ করতে পারবেন।

১.৩ মূল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস এবং বিভিন্ন রিপোর্ট ও সুপারিশ : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মূল্যায়ন ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষা প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ার পরবর্তী কাজ হল পাঠক্রম সংগঠিত করা। এটি হল লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠক্রমের অনুশীলন চলে। এরপর একটা নির্দিষ্ট সময়ে জানার দরকার হয় শিক্ষার্থী তার উদ্দেশ্য অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছে বা লক্ষ্য অর্জনের পথে সে কতখানি সাফল্য পেরেছে। স্বাভাবিক ভাবেই মূল্যায়নের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কিন্তু সেই মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। নিম্নে মূল্যায়নের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপিত করা হল ঃ

প্রাচীন সাহিত্য থেকে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এই ধরণের প্রথার প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে। Gileadite জর্ডন নদী অতিক্রম করতে ইচ্ছুক তাঁর শত্রু Ephraimitest দের নিধনের জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষার অকৃতকার্য হওয়া প্রায় ৪২০০০ শত্রুকে তিনি হত্যা করেন।

যতদূর জানা যায় পৃথিবীর প্রাচীনতম আর এক মূল্যায়ন ব্যবস্থা ছিল চীনদেশে। চীনদেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর প্রচীনতম পরীক্ষা ব্যবস্থা। তাদের শিক্ষার মূল ভিত্তিই ছিল পরীক্ষা। শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রী (উপাধি) প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পরীক্ষাগুলি পরিচালিত হত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা। শিক্ষার্থীদেব পরীক্ষার ফলাফল বা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের দ্বারা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল বা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ ঘটতো। চীনের মহামতি শান (shun) তাঁর কর্মচারীদের যোগ্যতা পরিমাপের জন্য লিখিত পর্যায়ন গ্রহণ করতেন। এটা ছিল চীনাদের জাতি রীতি।

ভারতবর্ষে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে বোঝায় বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এই বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথাগত কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে আচার্য বা গুরু শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বিচার করতেন। যোগ্যতা

বিচার হতো শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে। শিষ্যদের বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করাতে হত তা যথাযথ পালন করা হয়েছে কিনা তা বিচার করে যে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করা হত তা যথাযথ পালন করা হয়েছে কিনা তা বিচার করে আচার্য মূল্যায়নের চেষ্টা করতেন। পরবর্তী বৈদিকযুগে বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা ও বিদ্বৎজনের সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হত। বিতর্ক খুব প্রতিযোগিতামূলক হত। এই ধরনের বিতর্ক শোনার জন্য যথেষ্ট জনসমাগমও হত। বৈদিক গ্রন্থে এই বিতর্ককে বলা হয় 'ব্রহ্মোদয়'। সংস্কৃত সাহিত্য 'বিদ্যাবিবাদ' বা 'বিদ্যাবিচার' এর কথা বলা হয়েছে। বিচার হত বিচারকের সামনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। যে প্রশ্ন করত তাকে বলা হত প্রশ্নিন এবং যে প্রতিরোধ করত তাকে বলা হত 'অতিপ্রশ্নিন'। অনেকের মতে, বাকোবাক্যম্ বলতে এই ধরনের বিতর্ককে বোঝানো হয়েছে। তপোবন, রাজসভা, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে এইসব বিতর্ক বা আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হত। শিক্ষার্থীদের পাণ্ডিত্য বিচারের পর গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত বলে মনে করলে শিষ্যের শিক্ষাকাল সমাপ্ত হত ঘোষণা করবেন 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ব্রাহ্মণ্যযুগের অন্যতম উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞান যাচাই করা হত। শেষে সকল শিক্ষার্থীকে উপাধি প্রদান করা হত। যিনি প্রথম হতেন তাঁকে উপাধি দেওয়া হত কুলপতি।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীদের অধীত বিষয়গুলির উপর পরীক্ষা দিতে হত। এই পরীক্ষা হত মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে। মূল্যায়ন করা হত আবৃত্তি ও উপলব্ধি ক্ষমতা উভয় দিকের উপর। বৃত্তিমূলক জ্ঞান পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক কৌশল ব্যবহার করা হত। শিক্ষার্থীর এই মূল্যায়ন এককভাবে একজন শিক্ষকের দ্বারা না করিয়ে কয়েকজন শিক্ষকের দ্বারা মিলিতভাবে করানো হত। নালন্দার মত বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। অধ্যাপকমণ্ডলী এই পরীক্ষা গ্রহণ করলেও কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাদানের জন্য রাজসভাতেও উপস্থিত করানো হত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীদের 'স্থবির', 'বহুশ্রুত', 'পণ্ডিত' প্রভৃতি উপাধি প্রদান করা হত। বিক্রমশীলা মহাবিহারেও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। এই পরীক্ষাও ছিল মৌখিক ধরনের। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, উপাধ্যায়, ইত্যাদি উপাধি দেওয়ার রীতি ছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষদিক থেকে ভারতে মধ্যযুগের সূত্রপাত ঘটে। ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে, নতুন আর এক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়। মধ্যযুগের এই ইসলামিক শিক্ষাব্যবস্থাতেও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি জানার জন্য মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতেন। শিক্ষক প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের কিছু কাজ দিতেন। সেগুলি শিক্ষার্থীরা ঠিকমত করতে পারছে কিনা তা দেখতেন। এরপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হত। শিক্ষক যখন মনে করতেন শিক্ষার্থীর কোনো বিশেষ স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে তখন তাদের মূল্যয়ন করতেন। সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তী স্তরের শিক্ষার বিষয়সমূহ শিক্ষা শুরু করতেন। শিক্ষক কেন্দ্রিক এই ধরনের মূল্যায়ন ছাড়াও অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হত সার্বজনীন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আগত শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হত।

1840 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বোস্টন শহরে লিখিত পরীক্ষার প্রচলন শুরু হয়। পরে ক্রমশ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়। উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে তখন শিক্ষার দায়িত্বকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ব্রিটিশ

শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল 1854 খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচ। এই ডেসপ্যাচে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ তার মধ্যে একটি ছিল— লন্ডন বিশ্ব বিদ্যালয় এর ধাঁচে কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, এদের উদ্দেশ্য হবে পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং ডিগ্রী প্রদান করা। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শেষে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বলা যেতে পারে শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রিক। এই পরীক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক জ্ঞান পরিমাপ করা হত বলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব হত না। শিক্ষার লক্ষ্যই ছিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এর ফলে যেহেতু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কোন বয়সে একটা চাকুরী পাওয়া সম্ভবনা থাকতো, তাই পরীক্ষায় নানা অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কার্যত ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রাধান্য স্থায়িত্ব লাভ করে। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অথচ সারা পৃথিবীতে আমরা আধুনিক শিক্ষার হাত ধরে মূল্যায়নের ধারণা দ্রুত বদলাতে থাকে। পরীক্ষার পরিবর্তে সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে অনুভূত হতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই পরীক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার-এর প্রয়োজন হতে থাকে।

ভারতবর্ষে 1917-19 খ্রীষ্টাব্দের Calcutta University Commission বা স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সুপারিশ ছিল বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য Board of Secondary Education গঠনের। 1944 খ্রীষ্টাব্দে Central Advisory Board-এর রিপোর্টে (Sargamt Plan) প্রকাশিত হয় যে, বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত পাঠ্যক্রম আধুনিক নয়। প্রতি পনেরজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে সুযোগ পেতে সক্ষম। সেখানে পরীক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশটি ছিল ঃ "Every attempt should be made to devise and standardised objective type tests for use in this country so that they may supplement and ultimately replace the old type of examinations."

1947 খ্রীষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। 1948 সালে গঠিত হয় University Education Commission বা Radhakrishnan Commission। কমিশন বলেছেন, "যদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা একটি মাত্র সংস্কারও সুপারিশ করি তাহলে তা হবে পরীক্ষা সংস্কার ("We are convinced that if we are to suggest one single reform in University education, it should be that of examination.") কমিশন এমনও বলেছিলেন যে, পরীক্ষার যদি প্রয়োজন থাকে তার আমূল সংস্কার আরও বেশি প্রয়োজন। কমিশনের অভিমত ছিল শিক্ষা ও পরীক্ষার সর্বোচ্চ মান রক্ষাই হল বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রাথমিক কর্তব্য। পরীক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি থেকে পরীক্ষাকে মুক্ত করতে হলে বস্তুধর্মী পরীক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট স্থান পরীক্ষার মধ্যে থাকবে। শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষের কাজকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। শ্রেণিকক্ষের কাজের জন্য প্রতিটি বিষয় পূর্ণমানের এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট রাখাহবে। প্রথম ডিগ্রীর তিন বছরের পড়া কেবলমাত্র একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করা যুক্তিসম্মত নয়। সমগ্র সাধনমার্গে তিনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ Unit-এ ভাগ করে নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

1952-53 খ্রীষ্টাব্দে Secondary Education Commission (Mudaliar Commission 1952-53) পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রসঙ্গে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন ঃ

(i) রচনাধর্মী প্রশ্নকে যতটা সম্ভব কমিয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(ii) প্রতিটি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য উপযুক্ত নথি পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) বিদ্যালয়ের তৈরি শিক্ষার্থী সংক্রান্ত নথিকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(iv) গ্রেডিং প্রথার প্রচলন করতে হবে।

(v) শিক্ষার্থীকে শিক্ষাশেষে Public পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রদত্ত শংসাপত্রে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা তৈরি নথিরও প্রতিফলন থাকবে।

কমিশনের মতে কেবলমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে প্রমোশন দেওয়া চলবে না, সেই সঙ্গে অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষার্থীর অন্যান্য কাজকর্মের রেকর্ডও বিবেচনা করতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন করতে হবে।

কমিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয়। কোন একটিকরে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র কেবল অভ্যন্তরীণ অথবা বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষালাভ কিংবা তার পেশা স্থির করার জন্য তার সামগ্রিক পরিচয় লাভ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই কারণে বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থী দৈনন্দিন যে সব কাজকর্ম সম্পাদন করে সারা বছর ধরে তার একটি রেকর্ড রাখা জরুরী। এই ধরনের রেকর্ডে বিভিন্ন প্রকার আগ্রহ, প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, যে সব সামাজিক কাজকর্মে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। বলা যেতে পারে, শিক্ষার্থীর সমগ্র কর্মজীবনের পরিচয় এখানে থাকবে। দেশের সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

মুদালয় কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে All India Council for Secondary Education (AICSE) গঠিত হয়। AICSE র কাজের প্রসঙ্গে সেই সময়ের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন ".....an organisation to advice the Government of India and State Governments on the manner in which the recommendations of the commission could be effectively implemented."

এর পরবর্তীকালে ভারতসরকার 1964 সালের 14 ই জুলাই একটি প্রস্তাবনার দ্বারা আর একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন, যা কোঠারি কমিশন নামে পরিচিত। কমিশন 1964 সালের 2রা অক্টোবর কাজ শুরু করে 1966 সালের জুন মাসে রিপোর্ট পেশ করেন। বিদ্যালয় স্তরে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কমিশন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিশন শিক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতির প্রভূত সংস্কার সাধন ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও নমনীয়তা আমার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কমিশনের মতে, মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ও শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর মূল্যায়ন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মূল্যায়ন একদিকে যেমন শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ করে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার উন্নতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সুতরাং মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, বহিঃস্থ পরীক্ষা, সর্বাত্মক পরিচয় লিপি (Cumulative record card) প্রভৃতির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপর উপর জোর দেওয়া দরকার।

বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কমিশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) নিম্ন প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন ঃ (i) শিশুদের উপযুক্ত অভ্যাস, মৌলিক দক্ষতা এবং কাঙ্ক্ষিত প্রবণতা সৃষ্টির কথা মাথায় রেখে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কার্যকরী করার চেষ্টা করতে হবে। (ii) প্রথম শ্রেণি

থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত একটা অবিভক্ত ইউনিট হিসাবে স্থির করে শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলার সুযোগ দিতে হবে। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে একটি ব্লক হিসাবে গণ্য করে শিক্ষার্থীদের দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, ধীরগতি সম্পন্ন ও দ্রুতগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের গতিধারা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিচার করলে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, তার জন্য শিক্ষকদের অরিয়েন্টাশন কোর্স এবং রিফ্রেসার কোর্স পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে।

(২) উচ্চ প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন ঃ কমিশন বলেন মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এখানে শিক্ষক নিজেই তৈরি করবেন ত্রুটি নির্ণায়ক অভীক্ষার সূত্র। প্রতিটি ছাত্রের জন্য সহজ ধারাবাহিক বিবরণ পত্র সংরক্ষণ এবং সেই অনুসারে শিক্ষার্থীকে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের শেষে যথাযথ উপায়ে শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে সাময়িক সমীক্ষা (Periodic Survey) করা যেতে পারে। রাজ্য মূল্যায়ন সংস্থা (State Evaluation Organisation) দ্বারা নির্মিত প্রশ্নপত্র নিয়ে জেলার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীক্ষা পরিচালনার মান করতে পারেন।

(৩) প্রাথমিক স্তরের পাঠ শেষ হলে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র দিতে পারে। তবে সেই সঙ্গে বিদ্যালয়কে কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড (CRC) এবং বিদ্যালয়ে গৃহীত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্টও দিতে হবে।

(৪) অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পরিচালনা বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আরো বেশী ব্যাপক করতে হবে। বহিঃ পরীক্ষার সবকিছু এবং বহিঃ পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা যায় না এমন বিষয়গুলিও এর মধ্যে স্থান পাওয়া দরকার যেমন— শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কর্মসূচিকে নিয়ে হবে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শংসাপত্র প্রদানের জন্য কৃতিত্ববিচার করা ছাড়াও এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে যেন সাহায্য করতে পারে।

দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, সমাজের আধুনিকীকরণ, জাতীয় সংহতির কর্মসূচিকে সার্থকতা দানের জন্য শিক্ষার পুনর্গঠন প্রসঙ্গে ভারত সরকার 1968 খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) এবং যাথার্থ্যতা (Validity) ভিত্তিক প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। সংকীর্ণ অর্থে আমরা যাকে পরীক্ষা বলি, ব্যাপকতর অর্থে তা-ই মূল্যায়ন। মুল্যায়ন হল একটি ক্রমাগত বিরামহীন প্রক্রিয়া, তাই প্রচলিত পরীক্ষাকে মূল্যায়নে রূপান্তরিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর দ্বারা সম্পাদিত কোন একটি সাময়িক কাজের গুণ বিচার এর পরিবর্তে বিরামহীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই হবে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা বা সাফল্য এবং মান উন্নয়নের নির্দেশক মাধ্যম।

এই প্রসঙ্গে National Policy of Education—1968-তে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশের বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে— "A major goal of examination reforms should be to improve the reliability and validity of examinations and to make evoluation a continuous process aimed at helping the student to improve his level of achievement rather than at 'certifying' the quality of his performance at a given moment of time."

মূল্যায়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে 1986-এর জাতীয় শিক্ষানীতির বক্তব্যও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছে। ভারত সরকারের ঘোষিত এই শিক্ষা নীতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রস্তাবগুলি হল—

(i) পরীক্ষা হবে নৈব্যক্তিক ধরনের, অর্থাৎ নৈব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(ii) মুখস্থবিদ্যার উপর গুরুত্ব যথাসম্ভব কমাতে হবে।

(iii) সার্বিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে হবে।

(iv) শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদেরও এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

(v) সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় সাপেক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তন করতে হবে এবং সেইসঙ্গে পরীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে।

(vi) উন্নত পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষণ পদ্ধতির অনুকূল ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

(vii) মাধ্যমিক স্তর থেকে সেমিস্টার প্রথা চালু করতে হবে।

(viii) নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা চালু করতে হবে।

(ix) বহিঃপরীক্ষার প্রাধান্য হ্রাস করে প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মূল্যায়নকেই স্বাভাবিক ও অব্যাহত প্রবাহ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে NPE 1986 এর সুপারিশে বলা হয়েছিল— ".....National Examination Reform framework would be prepared to serve as a set of guidelines to the examining bodies, which would have the freedom to innovate and adopt the framework to suit the specific situations."

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—১ (Check your Progress—1)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) বিক্রমশীলা মহাবিহারে শিক্ষার্থীদের কি কি উপাধি দেওয়া হত?

খ) Board of Secondary Education গঠনের প্রস্তাব কোন কমিশন করেন?

গ) মূল্যায়ন সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের একটি সুপারিশ লিখুন।

১.৪ মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি

(ক) মূল্যায়নের অর্থ ও প্রকৃতি ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মূল্যায়ন। শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়ন বিষয়টিরও তাৎপর্য বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। এখন প্রশ্ন হল, মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? আভিধানিক অর্থে 'মূল্যায়ন' হল কোনো কিছুর উপর মুল্য আরোপ করা। কিন্তু কিসের ওপর মূল্য আরোপ? শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পাদিত আচরণের উপর মূল্য আরোপ করাই হল মূল্যায়ন। আবার যেহেতু ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী সামাজিক জীব তাই তার আচরণ ধারা সমাজ পরিস্থিতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। শিক্ষার্থীর সম্পাদিত আচরণ ধারার মূল্যায়ণ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেগুলিকে 'ভালো' বা 'মন্দ', 'ঠিক' বা 'ভুল' বলে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিক থেকে বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দ্বারা আচরণ পরিবর্তন কাঙ্খিত পদক্ষেপ।

শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে মূল্যায়ণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গেও বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আসলে, শিক্ষার্থীরা পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের পথে কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে তা যাচাই করার পদ্ধতিই হল মূল্যায়ন। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বা সার্বিক ঠিকানা সাধন। সুতরাং মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতিই যাচাই করা হয় না, শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, বোধ, দক্ষতা ইত্যাদির যেমন বিকাশ ঘটে তেমনি তার আবেগমূলক বা প্রক্ষোভ মূলক বিকাশ, চিন্তন ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, স্মরণশক্তি, যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার ও বিকাশ ঘটে; তার সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে, বিকাশ ঘটে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের। কার্যত বিকাশ ঘটে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তি সত্তার। অতএব, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত দিকের সম্পাদিত আচরণ ধারার মূল্য বিচার বা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ মূল্যায়ন হল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিচার করণের প্রক্রিয়া।*

আবার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার কোনো বিচ্ছিন্ন বিচারকরণ নয় বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতিদিন শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে ধরনের পরিবর্তন ঘটছে তার লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় মূল্যায়নে। সুতরাং মূল্যায়ন হল একটি অবিচ্ছিন্ন তথা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে কোঠারি কমিশন (1964-66) তার প্রতিবেদনে বলেছেন— "It is now agreed that evaluation, a continues process, forms an integral part of the total system of education."

আবার Nicto, Rawtree প্রমুখ শিক্ষাবিদ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন— "Evaluation in Education is such a continuous and endless process through which we can make judgement and take decisions about the aims and success of education comprehensively in the various contemporary perspectives."

মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বর্তমান সম্পাদিত আচরণেরই মূল্য নির্ধারণ করে না, শিক্ষার্থীর কোনো বর্তমান আচরণের উপর মূল্য আরোপ করার সময় পটভূমি বা প্রেক্ষাপট হিসাবে অতীত আচরণগুলিকে

* মূল্যায়নের সংজ্ঞার হিসাবে এজন্য Wesley বলেছেন— "It indicates all kinds of efforts and all kinds of means to ascertain the quality, value and effectiveness of desired outcomes. It is compound of objective evidence and subjective observation. It is the total and final estimate."

বিচার করতে হয়। শিক্ষার্থীর কোনো আচরণ তার তাৎক্ষণিক মূল্যে বিবেচিত হয় না, তার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রয়োজন হয়। তাই সেই দিক থেকে দেখলে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে— ব্যক্তির সম্পাদিত আচরণকে অতীতের প্রেক্ষাপটে বিচার করে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য আরোপিত করার প্রক্রিয়াই হল মূল্যায়ন। (Evaluation is the act of placing value of a performed behaviour in the light of the past performances and future possibilities.)। সুতরাং মূল্যায়ণের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক।

কুইলেন ও হ্যান্না (Quillen and Hanna) মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যে ধারণা তুলে ধরেছেন সেই অনুযায়ী তাঁদের মতে মূল্যায়ণ—

(i) শিশুর আচরণধারার সামগ্রিক বিচার বিবেচনার কৌশল নির্ধারণ করে।

(ii) শিশুর সদা পরিবর্তনশীল বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

(iii) একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণ ও শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কার্য করে।

(iv) শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে।

(v) শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝাই যায় যে, শিক্ষা এবং মূল্যায়ন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ভীষণভাবে সম্পর্কিত। পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সেই কার্যধারার ফলশ্রুতি বিচার করার জন্য মুল্যায়ন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সুতরাং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এর সন্ধান পাওয়া যায়—

(i) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,

(ii) শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি তথা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং

(iii) মূল্যায়ন কৌশল

অধ্যাপক বেঞ্জামিন ব্লুম (Benjamin Bloom) মূল্যায়ণের ধারণাটি ত্রিমুখী ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ব্লুম (Bloom) শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ককে একটি ত্রিভুজের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ঐ তিনটি বিষয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দিক। বেঞ্জামিন ব্লুম এর বর্ণনা অনুযায়ী ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং দুটি কৌণিক বিন্দুতে অবস্থান করে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন কৌশল। ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দুতে অবস্থিত তিনটি উপাদান বা দিক পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং মুল্যায়ন শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রক্রিয়া নয়। তাই বছর শেষে একটি মাত্র লিখিত বা মৌখিক অথবা উভয় প্রকার অভীক্ষা ব্যবহার করে, শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতা, গুণ ও যোগ্যতার বিচার যুক্তিসম্মত নয়। উদ্দেশ্যভিত্তিক পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিদ্যালয়ে সারা বছর পঠন-পাঠন কার্য পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা ও প্রয়োগ মূলক ক্ষমতা, আচার-আচরণ ও রুচির প্রগতিমূলক পরিবর্তন অবিচ্ছেদ্য ভাবে আসতে থাকে। সেজন্য সার্থক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন—

(i) সমগ্র শিক্ষাকাল ব্যাপী শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ রাখা,

(ii) সমগ্র শিক্ষাকাল ব্যাপী শিক্ষার্থীর জীবনের বিকাশের পরিবর্তনের বিবরণ,

(iii) পরিবর্তনের ধারা কতটুকু উন্নয়ন ধর্মী, তার সার্থকতা বিবেচনা করা,
(iv) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশের বিবরণ।

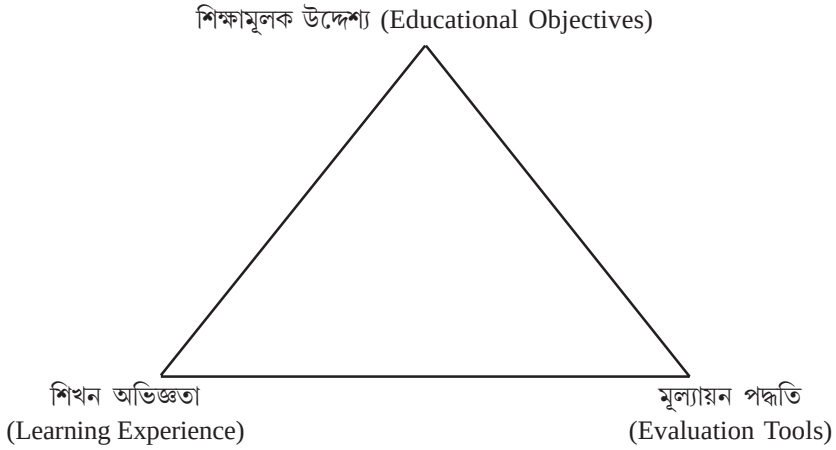

ব্লুমের বর্ণিত মূল্যায়ণ ত্রিভূজের চিত্ররূপ

মনোবিদ Gronland অধ্যাপক Bloom এর এই ত্রিমুখী মূল্যায়ন ধারণার সঙ্গে আরো একটি মাত্রা সংযোগ করেছেন। এই মাত্রাটি হল বিচারকরণ বা Value judgement। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কতকগুলি কৌশলের শুধুমাত্র সমষ্টিই নয়, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখন লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর মূল্য আরোপ করার একটি কাজ থাকে। মূল্য আরোপের কাজটি যিনি করেন তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও কিছু ভূমিকা মূল্যায়নে থাকে। তাঁর এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য মূল্যায়িত আচরণের মান নির্ধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে একটি অতিরিক্ত মাত্রা দেয়। সুতরাং মূল্য আরোপকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা মূল্যায়নকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এই প্রসঙ্গে Gronland বলেছেন, "Evaluation includes both qualitative and quantitative description of behaviour plus value judgement concerning the desirability of that behaviour."

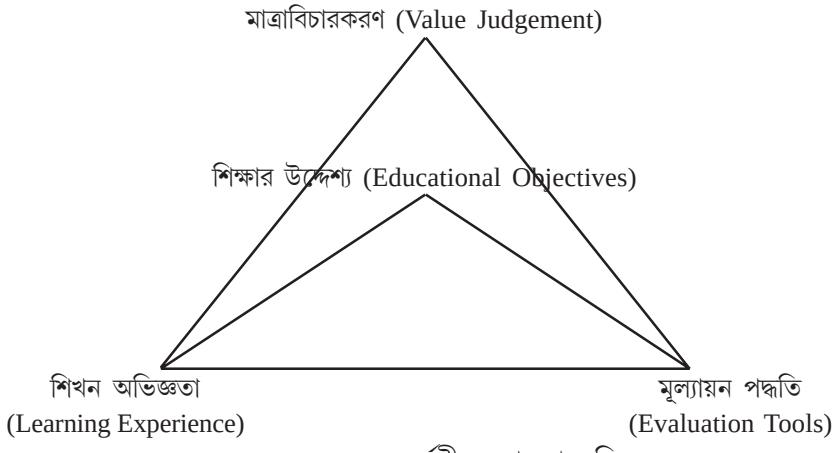

Gronland এর চতুর্মুখী মূল্যায়ণের চিত্র

উপরের আলোচনা থেকে আমরা মূল্যায়ণের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি উল্লেখ করতে পারি। নিম্নে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

(১) মূল্যায়ন একটি বিজ্ঞানসম্মত, নিয়মবদ্ধ এবং জটিল পরিবর্তনশীল পক্রিয়া।

(২) মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

(৩) মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিমাণগত ও গুণগত মানের বিচার করে থাকে।

(৪) মূল্যায়ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করে থাকে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হল দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, নৈতিক প্রভৃতি।

(৫) মূল্যায়ন হল চতুর্মুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে চারটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— (ক) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য (Educational objectives) (খ) শিখনমূলক অভিজ্ঞতা (Learning Experience), (গ) মূল্যায়ন পদ্ধতি (Evaluation tools) এবং (ঘ) মূল্য বিচারকরণ বা মাত্রা বিচারকরণ (Value Judgement)।

(৬) শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ণ যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাপ নির্দেশ করতে পারে।

(৭) মূল্যায়নের প্রধান কাজটিই হল শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য কতখানি কার্যকরী হয়েছে তার পরিমাপ নির্ধারণ।

(খ) মূল্যায়নের পরিধি (Scope of Evaluation) ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের ভূমিকা বা গুরুত্ব অনেকখানি। শিক্ষা প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীর জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন সূচিত হয় সেগুলি প্রকাশিত হয় ব্যক্তির আচরণ ধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই সমস্ত আচরণগুলির মূল্য বিচার করে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি খতিয়ে দেখা হয়, সহজ কথায় শিক্ষার্থীর আচরণগুলির উপর মূল্য আরোপ করা হয়। শিক্ষার্থীর আচরণগুলির উপর এই ধরনের মূল্য আরোপ করাই হল মূল্যায়ণের আসল কথা। শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত আচরণগুলির সঙ্গে যে যে বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সেগুলির প্রতিটির যথাযোগ্যতা যাচাই করা মূল্যায়নের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

(১) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যপূরণের যাচাইকরণ ঃ সচেতন প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সেই লক্ষ্যপূরণের পথে বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা কতখানি সার্থকতা লাভ করেছে তা জানার দরকার হয়। শিক্ষার এই লক্ষ্য পূরণ বা উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্রে কিভাবে যাচাই করা যায়, যাচাইকরণের ক্ষেত্রে কোন কোন পদ্ধতি বা কৌশল কাজে লাগানো যায়, কি কি উপকরণের সাহায্য নেওয়া যায়, সেগুলি কতখানি উপযুক্ত বা যথার্থ, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ মূল্যায়নের আলোচনার অন্তর্গত। কিন্তু মূল্যায়ন বলতে শুধুমাত্র শিক্ষার লক্ষ্যের অগ্রগতিরই মূল্যায়ন নয়, তার সঙ্গে যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, যে শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, সর্বোপরি সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তারও যথার্থতা সম্পর্কে মত ব্যক্ত করা মূল্যায়ণের আলোচনার পরিধিভুক্ত। সুতরাং মূল্যায়ন হল—

(ক) শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন

(খ) শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ন

(গ) পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন

(২) শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের যাচাইকরণ ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয় শিক্ষার্থীর

সর্বাঙ্গীন বিকাশের গুরুত্বের উপর। এই সর্বাঙ্গীন বিকাশ হল শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ। শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাই তার অন্যান্য দিকগুলির বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীর এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের অগ্রগতি ও তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব একমাত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারাই। কাজেই শিক্ষার্থীর সমস্ত দিকের যথাযথ অগ্রগতি জানা অত্যন্ত জরুরী আর এইজন্য অগ্রগতি জানার পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশলের বিভিন্ন প্রকরণ, তাদের কার্যকরী করার ব্যবস্থা প্রভৃতি মূল্যায়ণের আলোচনার অন্তর্গত বিষয়।

(৩) শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের পূর্বাভাস প্রদান ঃ শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশগত অবস্থা কেমন বা সেগুলির বর্তমান অবস্থা কিরূপ তা জানা জরুরী। কারণ শিক্ষার্থী তার নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে কতখানি দূরে বা সে কতখানি লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছে তা জানা যায় কিন্তু শিক্ষার্থীর এই বর্তমান অবস্থাটি জানাই একমাত্র কাজ মূল্যায়নের নয়। শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থা যাচাই করে বিচার বিশ্লেষণ করে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকৃতি সেইসঙ্গে তার পরিবেশগত অবস্থা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষামূলক পরিস্থিতি কিংবা ভবিষ্যৎ জীবনের পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া যায়। এই পূর্বাভাস করতে পারে মূল্যায়ন। সুতরাং সেদিক থেকে বলা যায় মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ বা যাচাই করে না, ভবিষ্যৎ-এর পূর্বাভাস সে প্রদান করে।

(৪) শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান ঃ আগেই আমরা দেখেছি মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক ধারণা। আর এজন্য শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশের নানা দিকের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাবলী সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই সমস্ত সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ ও বিচার করে তাকে নির্দেশনা দানের কাজটিও করা যায়। বস্তুত বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান কাজও হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশমা দান। শিক্ষার্থী প্রসঙ্গে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনাও স্বাভাবিকভাবেই মূল্যায়নের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এজন্যই বলা হয় মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দানের কাজও করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—২ (Check your Progress—2)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) মূল্যায়নের দুটি চরিত্র লিখুন।

খ) মূল্যায়নের দুটি পরিধি লিখুন।

গ) মূল্যায়নের চতুর্মুখী প্রক্রিয়ার চতুর্মুখ কি কি?

১.৫ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপ ও মূল্যায়ন

'মূল্যায়ন' শব্দটি আধুনিক ধারণার অন্তর্গত। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হতে হতে তার আধুনিক রূপ লাভ করেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই মূল্যায়ন শব্দটির প্রায় সমার্থক হিসাবে আমরা অনেক সময় পরিমাপ শব্দটিকে ব্যবহার করি। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শব্দ দুটি অর্থাৎ পরিমাপ ও মূল্যায়ণ সমার্থক নয়। কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে যখন কোন বস্তু ঘটনা ইত্যাদিতে সাংখ্যমাস প্রদান করা হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিমাপ। Tyler র মতে, পরিমাপ হল স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যা প্রদানের প্রক্রিয়া। Halmstadter-এর মতে, পরিমাপ হল কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য কি পরিমাণে রয়েছে তার সংখ্যামূলক বিবরণ। Nunnaly এর মতে, পরিমাপ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বস্তুর পরিমাণগত দিক নির্দেশের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে বস্তুতে সাংখ্যামান আরোপ করা হয়। পরিমাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"Measurement consists of rules for assigning numbers to objects in such a way as to represent qualities of attributes."

আবার পরিমাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে J.P. Guilford বলেছেন— "Measurement means the description of data in terms of numbers and thus, in term, means taking advantages of the many of benefits that operate with numbers and mathematical thinking process."

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করে পরিমাপ ও মূল্যায়নের কতকগুলি পার্থক্যকে চিহ্নিত করা যায়। সেগুলি হল—

(১) পরিমাপ একটি নির্দিষ্ট এবং সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিমাপের দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতার পরিমাপ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তির সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বা ক্ষমতার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মুল্যায়নের দ্বারা ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর সকল বৈশিষ্ট্যের বা ক্ষমতার গুণগত মান নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কোন একজন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান জানা যায় পরিমাপের দ্বারা কিন্তু তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোবিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির গুণগত মান নির্ধারণ সম্ভব হয় মুল্যায়ণের দ্বারা।

(২) পরিমাপ হল আংশিক প্রকৃতির। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও আচরণগুলিকে পৃথক পৃথক অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনাকরা হয়। যেমন, আমরা যখন শিক্ষার্থীর ভূগোল জ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান পরিমাপ করি, তখন তা বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক ভাবে। কিন্তু মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতি বিবেচনা করা হয়। সেই অর্থে মূল্যায়ন হল সামগ্রিক প্রকৃতির।

(৩) পরিমাপের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অধীতজ্ঞান বা অর্জিত অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য বিশেষ বিশেষ সময়ে সাময়িকভাবে কোনো পরীক্ষা বা অভীক্ষা প্রস্তুত করে তার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিন্তু মুল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিকাশশীল মানবশিশু বা শিক্ষার্থীর ক্রম পরিবর্তনশীল ব্যক্তিসত্তার যথাযথ মূল্য নির্ধারণের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

(৪) পরিমাপের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের শুধুমাত্র পরিমাণগত দিকটি জানা যায়, শিক্ষার্থীর গুণগত দিক সম্পর্কে তেমন কোন বিষয় জানা যায় না। অন্যদিকে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় দিকই প্রকাশিত করে।

(৫) পরিমাপের ফলে প্রাপ্ত ফল শিক্ষকের কাছে সবসময় তাৎপর্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে; কিন্তু মূল্যায়ন যেহেতু শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় তাই সেটি শিক্ষকের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(৬) পরিমাপের ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ উভয়ই কম প্রয়োজন হয়। কারণ শিক্ষার্থীর কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার জন্য একটি অভীক্ষার প্রয়োগই যথেষ্ট। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একাধিক অভীক্ষার প্রয়োগ করতে হয়, একাধিক কৌশলের সাহায্য নিতে হয়, স্বাভাবিকভাবেই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ উভয়ই বেশী প্রয়োজন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় শিক্ষাগত মুল্যায়ণ-এর পরিধি অতি ব্যাপক। শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীর সমস্ত রকমের আচরণের মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনার সমস্ত রকমের আলোচনা, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা তথা পাঠ্যক্রম এর মূল্যায়ন, শিক্ষাপদ্ধতির মূল্যায়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন সমস্ত কিছুই আধুনিক মূল্যায়নের আলোচনার বিষয় বস্তুর অন্তর্গত।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—৩ (Check your Progress—3)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) পরিমাপ কাকে বলে?

খ) পরিমাপের দুই উদাহরণ দিন।

গ) পরিমাপ ও মূল্যায়নের একটি পার্থক্য লিখুন।

১.৬ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

পরীক্ষা (Examination)

বাংলা পরীক্ষা শব্দটির ইংরাজী কথা হল 'Examination', 'Examination' কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Examen' থেকে, এর অর্থ হল দাঁড়ি পাল্লার কেন্দ্রদণ্ড, অর্থাৎ এর অর্থ হল কোন কিছুর পরিমাণ পদ্ধতি। সাধারণভাবে 'পরীক্ষা' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা কোনো নির্দিষ্ট মানের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা যাচাই করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই পরীক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সিক্ষাদান পদ্ধতি। এই কাদ্মজ করেন শিক্ষক। কিন্তু কোনো কিছু শেখানোর পরই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষককে মানতে হয় যে তার শিক্ষার্থী

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু কতখানি রপ্ত করেছে বা শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কিনা। আর এই বিষয়টি জানার জন্যই প্রয়োজন হয় পরীক্ষার। শিক্ষাদান কার্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ ধারায় যে পরিবর্তন আসে তা পরিমাণ করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। কার্যত শিক্ষার্থী তার শিক্ষার নির্দিষ্ট স্তরে কি শিখেছে, কতটুকু শিখেছে তার প্রামাণ্য পরিচয় হচ্ছে পরীক্ষার ফলাফল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শব্দ দুটিকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অথচ এই দু'টি পদ্ধতির লক্ষ্য ও কর্মধারার মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান বিচ্ছিন্ন ভাবে পরিমাপ করা হয় আর মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার সামগ্রিক পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক বিভিন্ন গুণাবলীর পরিমাণ করা হয়। মূল্যায়নের পরিধি যতখানি ব্যাপক ঠিক ততখানিই সংকীর্ণ হল পরীক্ষার ক্ষেত্র।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য (Purpose of Examination) :

(১) শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ ঃ শিক্ষার্থী শিক্ষার একটি স্তরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটুকু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করল তার পরিমাপ করা পরীক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

(২) শিক্ষার্থীর ত্রুটি নির্ণয়ে সাহায্য করা ঃ পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর ত্রুটি নির্ণয় যেমন হয় তেমনি শিক্ষার্থীর ত্রুটি দূর করে সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(৩) শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত গুণ ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ঃ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের যেমন পরিমাপ করা যায় তেমনি দ্বারা তার মানসিকতা, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন বা চর্চা প্রভৃতি গুণগত দিকগুলির বিকাশের অবস্থা জানা যায়।

(৪) পরবর্তী শিখনে প্রেষণা সঞ্চার ঃ পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে যেমন একটি ধারণা-লাভ করতে পারে তেমনি সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী শিখনের প্রস্তুতির জন্য প্রেষণা লাভ করে।

(৫) পরবর্তী উচ্চতর স্তর বা শ্রেণিতে উন্নীতকরণ ঃ পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে এক শ্রেণি থেকে তার পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়।

(৬) শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিশারী ঃ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল দেখে শিক্ষক অনেক সময় বিচার করতে পারেন শিক্ষার্থীর প্রবণতা কোন দিকে এবং সেই অনুসারে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। উচ্চতর শিক্ষার কোন দিকে শিক্ষার্থীর ঝোঁক বা সক্ষমতা আছে তার পূর্বাভাস দেওয়া হয়।

(৭) শিক্ষকের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা পরিমাণ ঃ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা পরিমাণ করা যায়, কারণ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফলে শিক্ষকের যোগ্যতা ও পারদর্শিতাও সক্ষমে দায়ী।

(৮) শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমের যথাযোগ্যতার বিচার ঃ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষাদান কালে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার যথাযোগ্যতা এবং অনুসৃত পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু যথোপযুক্ত কিনা তা যাচাই করা যায়।

(৯) শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ঃ শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা পেশাগত জীবন। এই বিষয়টি নির্ভর করে শিক্ষার্থীর নিজস্ব বৌদ্ধিক ক্ষমতা বা সামর্থ্য এবং বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উপর। পরীক্ষার

মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও প্রবণতা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে তাকে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়া যায়।

(১০) কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ঃ যে কোন কর্মপ্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কর্মীদের উপযুক্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। সেজন্য সীমিত সংখ্যক কর্মীকে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় যোগ্যতা প্রদর্শন করে প্রবেশ করতে হয়। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় নির্বাচনের কাজটি ভালভাবেই সম্পন্ন করে পরীক্ষা ব্যবস্থা।

মূল্যায়ন ও পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Evaluation and Examination):

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন দুটি পদ্ধতিই প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুটি পদ্ধতির মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য বর্তমান। পরীক্ষা খুব সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র বিষয় বস্তুর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয় কিন্তু মূল্যায়নের উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এইভাবে বিচার করলে মূল্যায়ন ও পরীক্ষার মধ্যেযে পার্থক্যগুলি আমরা দেখতে পাই সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

মূল্যায়ন ও পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য

মূল্যায়ন	পরীক্ষা
(১) মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং বহুমুখী।	(১) পরীক্ষার উদ্দেশ্য খুব সংকীর্ণ এবং একমুখী।
(২) মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া।	(২) পরীক্ষা একটি আংশিক প্রক্রিয়া। এটি মূল্যায়ণের একটি অংশমাত্র।
(৩) মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ পরিমাপ করা হয়।	(৩) পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র বিষয়জ্ঞান পরিমাপ করা হয়।
(৪) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়।	(৪) পরীক্ষায় সাধারণত প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করা হয় না।
(৫) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিকের মূল্য বিচার করা হয়।	(৫) পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র পরিমাণগত সাফল্য বিচার করা হয়।
(৬) মূল্যায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া।	(৬) পরীক্ষা হল একটি সহজ প্রক্রিয়া।
(৭) মূল্যায়ন নানান কৌশলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।	(৭) পরীক্ষা একক কোণ পারদর্শিতার অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়।
(৮) মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এটি সময় সাপেক্ষও বটে।	(৮) পরীক্ষা একটি বিচ্ছিন্ন, তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া এবং কম সময়েই সম্পন্ন করা যায়।
(৯) মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সামর্থ্য ও সম্ভাবনার নির্ধারণ সম্ভব।	(৯) পরীক্ষার দ্বারা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ সম্ভব।
(১০) মূল্যায়নে শিক্ষক, শিক্ষণপদ্ধতি, পাঠ্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানেরও মূল্য বিচার করা যায়।	(১০) পরীক্ষার মাধ্যমে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর মূল্য বিচার হয় তা ও আবার বিষয় জ্ঞানের আংশিক পরিমাপের দ্বারা।

পরীক্ষার প্রকারভেদ (Types of Examination):

শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর প্রদানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরীক্ষাকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (Oral Test)

(খ) লিখিত পরীক্ষা (Written Test)

(গ) ব্যবহারিক পরীক্ষা (Practical Test)

(ক) মৌখিক পরীক্ষা ঃ এই ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষক শিক্ষার্থীর (পরীক্ষার্থী) নিকট কতকগুলি প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন মৌখিকভাবে। পরীক্ষার্থী পেশ করা সেই সব প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানও করে মৌখিকভাবেই। এই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর পঠন ক্ষমতা, গুছিয়ে বলার ক্ষমতা, উচ্চারণের নির্ভুলতা, স্মরণ ক্ষমতা, ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, অনেক ক্ষেত্রে পঠনক্ষমতা, রুচি, মেজাজ ইত্যাদি বিচার করা হয়।

(খ) লিখিত পরীক্ষা ঃ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী (পরীক্ষার্থী) লিখিতভাবে উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরদান করে লিখিতভাবে। বিষয়ভিত্তিক কতকগুলি প্রশ্নের প্রকৃতি অনুসারে উত্তরদানের এই রীতি বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায়। শিক্ষক বা পরীক্ষক উত্তর পত্রগুলির মান নির্ধারণ করেন। এই লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে যেমন—

(i) বড় প্রশ্ন (রচনাধর্মী), (ii) মাঝারি প্রশ্ন, (iii) ছোট প্রশ্ন, (iv) নৈর্ব্যাক্তিক।

(গ) ব্যবহারিক পরীক্ষা ঃ শিক্ষার্থীর পুঁথিগত তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগধর্মীতা দেখার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের বিষয়জ্ঞানকে মাপার জন্য এই পরীক্ষার প্রচলন দেখা যায়। এই ধরনের পরীক্ষায় যেমন মৌখিক উত্তরদানের প্রয়োজন হয় তেমনি হাতে কলমে কাজের দ্বারাও শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে হয়।

বহিঃপরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (External and Internal Examination)

পরিচালনগত দিক থেকে পরীক্ষাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন— (i) বহিঃ পরীক্ষা (External Examination) (ii) অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (Internal Examination)।

(i) বহিঃ পরীক্ষা ঃ বিদ্যালয়ের বাইরের কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যখন কোন পরীক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে তখন সেই পরীক্ষাকে বলা হয় বহিঃ পরীক্ষা। যেমন— পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা, পঃ বঃ উচ্চমাধ্যমিক সংসদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রতিটি শিক্ষাস্তরের শেষে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান অর্জন করে তা বহিঃ সংস্থা পরিচালিত পরীক্ষায় দ্বারা পারদর্শিতা দেখায়। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তরপত্রের মূল্যায়ন, ফলাফল ও তার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট বা শংসাপত্র প্রদান সবই করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত ঐ সমস্ত বহিঃ সংস্থাগুলি।

(ii) অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ঃ শিক্ষার্থী যে বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা অর্জনের কাজ সম্পন্ন করে সেই বিদ্যালয়ই যখন নিজস্ব শিক্ষক শিক্ষিকাদের দ্বারা পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করে, তখন সেই পরীক্ষাকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বা অন্তঃ পরীক্ষা। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যেমন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, যান্মাসিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষা এই অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট সময় অন্তরে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করার জন্যই এই ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি (Demerits of Conventional Examination System) :

প্রায় কয়েক শতাব্দী পূর্ব হতে আধুনিক পরীক্ষার যে সূত্রপাত ঘটেছিল ভারতবর্ষে তা বিস্তৃত হয়েছিল প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এর বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করা হয়। স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ ক্রমে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারও হয়েছে অনেকখানি। বর্তমানে নৈর্ব্যক্তিক থেকে রচনাধর্মী বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নও সংবলিত হয়েছে শুধুমাত্র রচনাত্মক প্রশ্নের পরিবর্তে। তথাপি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ সবার মধ্যেই। পরীক্ষাকেন্দ্রিক এবং পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের বিরুদ্ধে আজ তীব্র সমালোচনা দানা বেঁধেছে সর্বস্তরে কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা সত্ত্বেও যেন কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটিগুলি প্রসঙ্গে। নিম্নে সেই ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক চাপে রাখতে বাধ্য করে। পরীক্ষায় ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে পারিবারিক তথা সামাজিক চাপেরও শিকার হতে শিক্ষার্থীদের। অথচ এই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি তাদের কর্মজীবনের প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও খুব একটা সাহায্য করে না।

(ii) পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভাবে বিদ্যালয়ের প্রকৃত শিক্ষা সূচক কোন কাজ হয় না। এই অভিযোগ অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের।

(iii) পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পিতামাতার বা অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বা তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—৪ (Check your Progress—4)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) পরীক্ষা শব্দটির উৎপত্তি কি?

খ) পরীক্ষা ও মূল্যায়নের একটি পার্থক্য লিখুন।

গ) লিখিত পরীক্ষার প্রকারভেদ লিখুন।

১.৭ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বয়স ছয়-এর কম। কাজেই এইসময় লিখিত পরীক্ষার ব্যবহার কম। বরঞ্চ এইসময় মূল্যায়ন, মূল্যায়ন-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল শিশুর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, শিশুকে বিভিন্ন বিষয় দেখতে, শুনতে, বুঝতে এবং করতে শেখানো এবং কতটা তা পারল তার পরিমাপ করা। কাজেই এই সময় উচ্চশ্রেণীর মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তে ধারাবাহিক সুসম্বধ্য মূল্যায়ন অনেক বেশী জরুরী।

এবারে আসা যাক পাঠক্রমে মূল্যায়নের গুরুত্ব কি, তা অনুধাবন করা। পাঠক্রম হল একটি বিশেষ স্তরে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সমস্ত লক্ষ, উদ্দেশ্য এবং তা পূরণ করার জন্য নির্ধারিত পাঠক্রম, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, পরিমাপের বিভিন্ন ব্যবস্থা সমস্ত কিছুরই মূল্যায়ন করা। সংক্ষেপে বলতে গেলে মূল্যায়ন একটি কাঠামোর প্রকল্প প্রস্তুত করে দেয়; এই কাঠামোতে একটি নির্দিষ্ট স্তরে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ কিভাবে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর অগ্রগতি এবং সাফল্যই নির্দেশ করেনা; বস্তুত মূল্যায়নের দ্বারা পঠন-পাঠন পদ্ধতির ভাল এবং মন্দ দিকগুলি জানা যায়। পাঠ্যক্রমের ত্রুটি, পাঠদানে ব্যবহৃত শিক্ষা সহায়ক উপকরণসমূহ, পাঠ্যক্রম এমনকি মূল্যায়নের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং কিভাবে সেগুলো দূর করা যেতে পারে তাও নির্দেশিত করে দেয়। কাজেই মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিশুর একটি নির্দিষ্ট সময় অগ্রগতির পরিমাপ না করে সমস্ত বছর ধরে শিশুর প্রত্যেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এবং এ সম্পর্কীয় সমস্ত কিছুর খুঁটিনাটির প্রতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে। ঐ সমস্ত তথ্য শিক্ষক/শিক্ষিকা বিশ্লেষণ করবেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশিত করে তা দূর করার জন্য নির্দেশ দেবেন। এর ফলে পরবর্তী মূল্যায়নে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে দূর করা যাবে এবং পূর্বের থেকে শিশু কতটা উন্নতি করতে পেরেছে তা বোঝা যাবে। কাজেই পাঠ্যক্রমে মূল্যায়নের স্থান দুটি ঃ প্রথমত সঠিকভাবে শিশুকে পাঠ্যক্রম সম্পর্কীয় বিষয়বস্তু সরবরাহ করা এবং দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নতি ঘটানো আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, অথবা শুধুমাত্র পাঠ্যক্রম শেষ করার পরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় সিদ্ধান্ত নেবার জন্যই ব্যবহারের জন্য নয়। যদি মূল্যায়নকে যদি ঐভাবে গ্রহণ করা হয় তবে কিন্তু তা শিখনের পদ্ধতি হিসাবেই ব্যবহার হবে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর বিষয় হিসাবেই ব্যবহার হবে এবং শিক্ষক-শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষক/শিক্ষিকা বা শিক্ষার্থী কাছে একটি সময়ের পরে তা আর প্রয়োজনীয় থাকবে না। তার থেকেও প্রয়োজনীয় হল এর সঙ্গে কিন্তু তবে পাঠ্যক্রমের সম্পর্কও থাকবে না। এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল এর ফলে পরীক্ষার, তার পরবর্তী ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ভয়, উদ্বেগ, মানষিক চাপ ইত্যাদির বৃদ্ধি হবে। এর ফল শিশুর ভবিষ্যত জীবনে পক্ষে মোটেই শুভ নয়। কিন্তু যদি মূল্যায়নকে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে শিক্ষার্থী পরীক্ষার সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে উদ্বেগ, ভয় বা আশংকার বিষয় হিসাবে গ্রহণ না করে তা শিক্ষার্থীর শিখনের ত্রুটি নির্ণয়, তার প্রতিকার এবং শিখন কার্যের অগ্রগতির পদ্ধতি হিসাবেই গ্রহণ করবে। পাঠ্যক্রমে মূল্যায়নের পরিধি তাই অনেক ব্যাপক। এর ফলে শুধু মাত্র শিশুর লেখাপড়ার অংশই নয়, শিশুর জীবনের সমস্ত দিক যেমনঃ ব্যক্তি সত্তার বিকাশ, প্রক্ষভের সঠিক নিয়ন্ত্রণ, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার, মনোভাব ইত্যাদির সঙ্গে বিষয় সম্পর্কিত এবং বিষয় বহির্ভূত সমস্ত দিকেরই পরিমাপ করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ এবং মূল্যায়নের গুরুত্ব একই সঙ্গে দেখা উচিত। এর ফলে মূল্যায়নকে পরীক্ষা ব্যবস্থার

একটি সংশোধিত রূপে না দেখে একে ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করলে শিশুর শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, শিক্ষাপদ্ধতি, বিদ্যালয়, পাঠ্যক্রম, এমনকি পিতা-মাতা, সহপাঠী ইত্যাদি সমস্ত দিকের গুণ, দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ঐ সমস্ত দিকগুলোকে আরো উন্নতি ঘটিয়ে ঐগুলো দূর করে শিশুর আরো অগ্রগতির ক্ষেত্রগুলোকে পরিবর্তন ঘটানো যায়। এমনকি শিক্ষক/শিক্ষিকার ক্ষেত্রেও এই ধরনের মূল্যায়ণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁরা এর ফলে তাদেরও পরিবর্তন ঘটানো ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারবে।

মূল্যায়ন যে যে ক্ষেত্রে শিশুর ক্ষমতার পরিমাপ করে সেগুলি নিম্নরূপ। এগুলো জানা প্রয়োজন কারণ এগুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিক্ষার অন্য সব দিক, যেমন ঃ পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, শিখন সহায়ক উপকরণ সমূহ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে মূল্যায় নিম্নলিখিত দিকগুলির প্রতি গুরুত্ব দেয় ঃ

(ক) বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন দক্ষতা কতটা অর্জন করেছে তা জানা ;

(খ) ওই ক্ষেত্রে কোন কোন দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে তা মূল্যায়ন করা ;

(গ) শিশুর প্রত্যেকটি দক্ষতা, আগ্রহ, প্রবণতা এবং প্রেষণার উন্নতি করা ;

(ঘ) শিশুর শারীরিক সুস্থতা এবং সৃষ্টিশীল জীবনের ভিত্তি গঠন করা;

(ঙ) নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর শিখন, আচরণ এবং উন্নতির নিয়ন্ত্রণ করা;

(চ) বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং সুযোগের ক্ষেত্রে সঠিক সারাদিতে সাহায্য করা;

(ছ) শিশু বিভিন্ন পরিবেশে, অবস্থায় এবং পরিস্থিতিতে যা শিখেছে তা প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং মূল্যায়ণ করা;

(জ) একা এবং যৌথভাবে শিশু কাজ করতে পারে কিনা তা মুল্যায়ন করা;

(ঝ) বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(ঞ) সামাজিক এবং পরিবেশগত বিষয় সম্পর্কে কতটা অবহিত হয়েছে এবং তা কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায় তা জানা;

(ট) সামাজিক এবং পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত হবার ক্ষমতা মূল্যায়ন;

(ঠ) নির্দিষ্ট সময় ধরে শিশু যা শিখেছে তা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

১.৮ সারসংক্ষেপ

শিক্ষায় মূল্যায়নের ব্যবহার দীর্ঘদিনের হলেও খুব প্রাচীন নয়। ভারতে স্বাধীনতা লাভের পরে শিক্ষা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কয়েকটি কমিশন তৈরী হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮) বলেছেন যে শিক্ষার যদি সংস্কার প্রয়োজন হয় তবে পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার আরো জরুরী। মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) সুপারিশ করেন পরীক্ষা সংস্কারের জন্য। কমিশনের মতে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার বদলে শিশুর সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা একান্ত জরুরী। তবে কোঠারী কমিশন (১৯৬৪) সব থেকে জোরালোভাবে মূল্যায়নের সুপারিশ করেন। কমিশন নিম্নস্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড ব্যবহারের সুপারিশ করেন। ১৯৮৬ সনের জাতীয় শিক্ষানীতির ঘোষণায় ও মূল্যায়নের কথা বলা হয়।

দ্বিতীয় অংশে মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূল্যায়ন কোন

বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয় বরঞ্চ এটি একটি ধারাবাহিক প্রকৃয়া এবং মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রকৃয়াও বটে। মূল্যায়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঃ

(i) শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য,
(ii) শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং
(iii) মূল্যায়ন কৌশল।

এই তিনটি দিক পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। গ্রুনল্যান্ড এই তিনটি দিকের সঙ্গে আরো একটি দিক যুক্ত করেছেন তা হ'ল ঃ মাত্রা বিচার করণ, মূল্যায়নের পরিধি ব্যাপক। শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত আচরণগুলির সঙ্গে থেকে বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সেগুলির প্রতিটির যথাযোগ্যতা যাচাই করাও মূল্যায়নের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় অংশে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্য, পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পার্থক্য, বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পরীক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের শেষ অংশে প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১.৯ অনুশীলনী

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ১৫০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে কি বলেন?
(ii) মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিন।
(iii) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কত রকম হয়?
(iv) প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার দুইটি ত্রুটি লিখুন।

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৩০০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) মূল্যায়ন সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) তে কি বলা হয়?
(ii) মূল্যায়নের সম্পর্কে গ্রোনল্যান্ড-এর বক্তব্য লিখুন।
(iii) পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি?
(iv) মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি লিখুন।

(গ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৫০০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) কোঠারী কমিশন মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি সুপারিশ করেন?
(ii) মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।
(iii) মূল্যায়নের পরিধি আলোচনা করুন।
(iv) পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য কি?

১.১০ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর সংকেত

উত্তর সংকেত—১

(ক) স্থবির, বহুশ্রুত, পণ্ডিত ইত্যাদি।

(খ) স্যাণ্ডলার কমিশন।

(গ) নিম্ন প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ন।

উত্তর সংকেত—২

(ক) এটি একটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি; এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

(খ) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যপূরণের যাচাইকরণ এবং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত পূর্বাভাস প্রদান।

(গ) শিখন অভিজ্ঞতা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং মাত্রা বিচারকরণ।

উত্তর সংকেত—৩

(ক) কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ নির্ণয়।

(খ) পরীক্ষার খাতা দেখে নম্বর দেওয়া এবং ১ কেজি চিনি।

(গ) পরিমাণ নির্দিষ্ট একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার হয় কিন্তু মূল্যায়ন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয় এবং ব্যক্তির বা বস্তুর গুণগত মান নির্ধারণ করা হয়।

উত্তর সংকেত—৪

(ক) ইংরাজী Examination এসেছে ল্যাটিন 'Examin' থেকে।

(খ) মূল্যায়ন ব্যাপক ও বহুমুখী কিন্তু পরীক্ষা সংকীর্ণ এবং একমুখী।

(গ) রচনাধর্মী, মাঝারি, ছোট, নৈর্ব্যাক্তিক।

একক ২ ❑ নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের ধারণা

গঠন

২.১ ভূমিকা **(Introduction)**

২.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

২.৩ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন **(CCE) (Continuous and Comprehensive Evolution)**

২.৩.১ **CCE** কি, কেন, কখন?

২.৩.২ **CCE** প্রকৃতি এবং পরিধি

২.৪ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় **CCE**-এর লক্ষ **(Aims of CCE in Pre-primary Education)**

২.৫ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

২.৬ অনুশীলনী **(Exercises)**

২.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints to check your progress)**

২.১ ভূমিকা

পূর্বের এককে (একক—১) আমরা মূল্যায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা মূল্যায়ণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা এবং বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

এই অংশে আমরা ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করব। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় এর উপর বেশী গুরুত্ব দেয়।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিশুদের বয়স ২-এর উপরে এবং 6 এর নীচে। অর্থাৎ এইসময়ে শিশুদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটে। কাজেই ঐ সময় শিশুদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই স্তরে ইন্দ্রিয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিকাশ এবং বৌদ্ধিক বিকাশ ও অন্যতম লক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

২.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি শেষ করার পরে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ণের (CCE) অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে জানবে, বুঝবে এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।
- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় CCE-র লক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞাত হবেন।

২.৩ নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন

২০০২ সনে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীতে শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হিসাবে ২১ক ধারায় যুক্ত করা হয়। তবে এক্ষেত্রে বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হয় ৬ থেকে ১৪ বৎসর। কিন্তু সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে কিছু বলা নেই বটে, তবে ঐ সংশোধনীতে ৪৫নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

রাষ্ট্র শিশুর ছয় বৎসর পর্যন্ত তাদের প্রতি যত্ন ও শৈশবকালীন শিক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

১৯৮৯ সনে ইউ.এন. কনভেনসনে শিশুর অধিকারের সনদ গৃহীত হয়। ভারত সরকার ঐ সনদে ১৯৯২ সনে স্বাক্ষর করেন। ঐ সনদে শিশুর যে সব অধিকার স্বীকৃত হয় তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

(১) শিশুর সম্মান এবং ভাবপ্রকাশের অধিকার (Dignity and Expression)

(২) শিশুর বিকাশ (Development)

(৩) শিশুর যত্ন এবং সুরক্ষা (Care and Protection)

ভারত সরকারের প্রকাশিত National Commission for Protection of Child Right (NCPCR)-এর তিনটি বিভাগে শিশুর বিকাশের জন্য যে সব কথা বলা হয়েছে তার কয়েকটি হল ঃ

(i) Dignity and Expression ;

- I have rights being a child ..... (Article 2)
- I have the rights to express my views freely which should be taken seriously..... (Article 12,13)
- I have the right to make mistakes, and everyone has the Responsibility to accept we can learn from our mistakes.....(Article 28)
- I have the right to be included whatever my abilities. .....(Article 23)

(ii) Development :

- I have the right to a good education, and everyone has the Responsibility to encourage all children to go to school. ..... (Article 23, 28, 29)
- I have the right togood health care, and everyone has the Responsibility to help others get basic health care and safe water .....(Article 24)
- I have the right to a clean environment and every one has the responsibility no to pollute it. ..... (Article 29)
- I have the right to play and rest. .....(Article 31)

(iii) Care and Protection :

- I have the right to be loved and protected from harun and abuse ..... (Article 19)
- I have the right tolive without violence ..... Article (28, 37)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় CCE গুরুত্ব এখানেই।

২.৩.১. CCE কি, কেন এবং কখন ?

CCE-র আলোচনার প্রথমেই জেনে নেব CCE কি?

আমরা সকলেই চাই শিশুর বিকাশ ঘটুক তার নিজের মত, শিশুর চাহিদা, রুচি, সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটুক তার নিজস্ব গতি এবং পদ্ধতিতে। কাজেই আমরা সকলেই চাই বিদ্যালয় হবে এমন জায়গা যেখানে শিশু শিখবে আপন ছন্দে, নিজের ইচ্ছায়। কিন্তু শিশুর ইচ্ছে কি তা কে জানবে, কিভাবে জানবে? শিশুর চাহিদা কি, কতটা তা পূরণ হচ্ছে? তার পরিমাপ কে করবে, কিভাবে হবে? শিশুর মনের সৃজনশীলতার বিকাশ কিভাবে ঘটানো হবে? তা সঠিক হয়েছে কিনা তা কি ভাবে জানা যাবে? এসব প্রশ্ন আর তার উত্তর দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। এর পরিমাপের পদ্ধতি শুধুমাত্র পরীক্ষা নেওয়া আর তার ফল পকাশের দ্বারাই হবে না। সেক্ষেত্রে চাই শিশুকে আরো গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করা, তার আবেগ, তার ভালবাসা, তার ভাল না লাগাকে গভীরভাবে দেখা এবং বোঝা। এটা কেবল একদিনের পরীক্ষার মাধ্যমেই হবে না, চাই প্রত্যেক দিনের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং পরিক্ষণ। এর পর প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুর অগ্রগতির তথ্য জানা যাবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ভাবেন অন্যভাবে। তাতে কিন্তু শিশুর বিকাশ এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

জন্তুদের বিদ্যালয়

অনেকদিন আগের কথা। জন্তুরা ঠিক করল 'নতুন পৃথিবীর' সমস্যা সমাধানের জন্য তারা সাংঘাতিক কিছু করবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল একটি বিদ্যালয় করার। তাদের ছোট ছোট শিশুরা তাতে লেখাপড়া, আদব-কায়দা শিখবে। তারা মানুষদের মতই 'সক্রিয়তা ভিত্তিক' পাঠক্রম তৈরী করল। সেই পাঠক্রমে রাখা হল দৌড়ানো, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা এবং ওড়া। পাঠক্রমকে সহজে প্রয়োগ করার জন্য সবার জন্য সব বিষয়কেই আবশ্যিক করা হল।

হাঁস চমৎকার উড়তে পারে; সত্যি কথা বলতে কি তার শিক্ষকের থেকেও ভাল উড়তে পারে। কিন্তু সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে উড়ান শিখতে গিয়ে সে শুধু পাশের গ্রেড পেল এবং দৌড়ানোতে খুবই খারাপ ফল করল। যেহেতু সে দৌড়ানোতে ফল খারাপ করেছে, সে জন্য বিদ্যালয়ের ছুটির পরেও তাকে থাকতে হল এবং এর জন্য হাঁসকে সাঁতার কাটাও ছাড়তে হ'ল। দৌড়ানোর অনুশীল চলতেই থাকল এবং শেষ পর্যন্ত হাঁসের পায়ের জোড়া চামড়াই ফেটে গেল; আর এর ফলে তার সাঁতারের দক্ষতা আরো কমে শেষ পর্যন্ত সাঁতারেও খুবই সাধারণ ফল করল। কিন্তু সাধারণ ফল বিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্য, তাই হাঁস ছাড়া আর কেউ কিছু মনেই করল না।

খরগোস দৌড়ানোতে তার শ্রেণিতে সবথেকে ভাল; কিন্তু ধীরে ধীরে সাঁতার কাটার কঠিন নিয়ম কানুন শিখতে গিয়ে তার নার্ভের রোগ শুরু হল।

কাঠবেড়ালী গাছে চড়ায় বেশ দক্ষ। কিন্তু ধীরে ধীরে সেও হতাস হল; কারণ মাষ্টার মশাই-এর নির্দেশ হল মাটি থেকে উড়তে হবে। গাছে উঠে তারপর ঝাপিয়ে পড়া মোটেই চলবে না। শেষ পর্যন্ত সে অনিদ্রা রোগে পড়ল, অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য। পরীক্ষায় সে গাছে উঠায় 'সি' এবং দৌড়ানোতে 'ডি' গ্রেড পেল।

শকুন সবসময়েই অবাধ্য এবং দূরন্ত। তাই তাকে কঠিন শৃঙ্খলায় রাখা হ'ল। গাছে চড়ায় সে

সবার থেকে দক্ষ। কিন্তু উড়ে গিয়ে গাছে বসলে হবে না; নীচের থেকে বেয়ে উঠতে হবে। আর সেখানেই তার বিপত্তি।

বছরের শেষে, সাঁতারের দক্ষ প্রতিবন্ধী বানমাছ দৌড়ানো, গাছে চড়া এবং উড়ানোতে সবথেকে উঁচু গ্রেড পেল এবং তাকেই সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হল।

এই উদাহরণ প্রাণীদের বিষয়ে বলা হলেও এটা মানুষদের স্কুলেই প্রযোজ্য; যদিও বিভিন্নভাবে আমরা জানি যে শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতির পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরী। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় এই বিষয়টি আরও জরুরী কারণ এই সময় শিশুর বিকাশ সঠিকভাবে না হলে তার প্রভাব সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে। ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিশুর বিভিন্ন দিকের শিক্ষণ-শিখন এর পরিমাপ সুসংহতভাবে করা যায়। এই দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

- শিশুদের পরিমাপ কেন প্রয়োজন?
- কি কি পরিমাপ করা দরকার?
- কখন পরিমাপ করা প্রয়োজন?
- কিভাবে পরিমাপ করা উচিত?
- কিভাবে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা দরকার?

এককথায় বলতে গেলে পরিমাপ পদ্ধতি শিশুর শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিমাপের দ্বারা জানা যাবে ঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর কোন কোন ক্ষেত্রে বিকাশ প্রয়োজন?
- ঐ স্তরের শিক্ষার শেষে শিশুর কাছে কি কি কাম্য তা স্থির করা।
- শিশুর ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি হওয়া দরকার তার তালিকা প্রস্তুত করা।

"শিক্ষা হল ..... আপনার শিশুর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে জানা এবং তা শুধুমাত্র কিছু দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, মানসিক বা নৈতিক বিষয়ের মত অংশবিশেষ নয়। শিশুকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখলে চলবে না; তাকে দেখতে হবে সম্পূর্ণরূপে। শিক্ষার মাধ্যমে তাকে মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে হয়ে ওঠে সৃজনশীলতা সক্ষম। বুদ্ধি তার কাছে বোঝা হয়ে উঠবে না এবং সে একমুখী না হয়ে হবে পরিপূর্ণ। শিশু কোন এক নির্দিষ্ট সমাজের, কোন জাতির, কোন ধর্মের না হয়ে সেই শিক্ষা এবং বুদ্ধির দ্বারা শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে উঠবে এবং এর ফলে শিশু তার নিজের জীবন গঠনে সক্ষম হবে; শিশু যন্ত্রণা হয়ে মানুষ হয়ে উঠবে।"

—জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি।

তাহলে ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ন কাকে বলে?

ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ন হল ছাত্রের বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের পরিমাপ করা হয়। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুটি উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ দুটি উদ্দেশ্য হল ঃ মূল্যায়ণের ধারাবাহিকতা এবং অপরটি হল বিস্তারিত শিখনের এবং আচরণগত পরিবর্তনের পরিমাপ।

এখানে দুটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক এবং সুসংহত। 'ধারাবাহিক' কথার অর্থ হল শিক্ষার্থীর 'বৃদ্ধি

এবং বিকাশ' এর বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতিতে কিন্তু পরিমাপের পরেও এত বিস্তৃতভাবে শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্বন্ধে জানা যায় না। ধারাবাহিক মূল্যায়ণে ঘন ঘন প্রতিটি শিখন এককের পরিমাপ, শিখন এবং প্রত্যাশিত ফলের মধ্যে পার্থক্যের কারণ নির্ণয়, কারণগুলির দূরকার চেষ্টা এবং পরিশেষে পুনরায় পরিমাপ এবং ফিডব্যাক ব্যবহারের পরে তা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আত্ম-মূল্যায়নের জন্য দেওয়া হয়।

অন্যদিকে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থাৎ 'সুসংহত' কথাটির দ্বারা শিক্ষার্থীদের পান্ডিত্যমূলক (Scholastic) এবং সহযোগী (co-scholastic) বিষয়গুলির বৃদ্ধি এবং বিকাশকেও বোঝায়। যেহেতু শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, প্রবণতা বা ঝোঁক কেবলমাত্র লিখিত পরীক্ষার দ্বারাই জানা যায় না, তাই এর জন্য নানারকম টুল এবং কৌশল ব্যবহারের দ্বারা এগুলির পরিমাপ করা হয়। যে সমস্ত দিকগুলিতে শিক্ষার্থীর পরিমাপ করা হয় তা হল ঃ

- জ্ঞান (knowledge)
- বোধ (understanding)
- প্রয়োগ (Applying)
- বিশ্লেষণ (Analyzing)
- মূল্যায়ন এবং (Evaluation) এবং
- সৃজনশীলতা (creativity)

CCE কেন বুঝতে গেলে জানতে হবে এর উদ্দেশ্য; কারণ উদ্দেশ্যের দ্বারাই বোঝা যাবে CCE কেন?

ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য (The Objectives of CCE) :—

NCERT-র পরীক্ষা সংস্কার বিভাগ CCE-র উদ্দেশ্য হিসাবে যা বলেছেন সেগুলো হল ঃ

- প্রজ্ঞামূলক, মানসিক সঞ্চালন মূলক এবং অনুভূতিমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটানোয় সাহায্য করা।
- মুখস্থ করা আয়ত্ত করার পরিবর্তে চিন্তন প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব দেওয়া;
- মূল্যায়নকে শিক্ষণ-শিখন প্রকৃয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করা;
- নিয়মিত শিক্ষার্থীর সমস্যা নিরূপণ এবং তার সমাধান করার জন্য শিখন-শিক্ষণ প্রকৃয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের মূল্যায়ন করা;
- সঠিক ভাবে নির্ধারিত লক্ষ সম্পাদনের জন্য মূল্যায়নকে মান উন্নয়নের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা;
- কোন পরিকল্পনার সামাজিক ব্যবহার, প্রয়োজনীয়তা এবং সঠিক প্রয়োগ নির্ণয় করা ও শিক্ষার্থী, শিখন পদ্ধতি এবং শিখন পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- শিক্ষণ এবং শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা।

(Examination Reform, NCERT)

CCE কখন?

শিক্ষা এবং শিখন উভয়েই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কাজেই এই প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন একটি বা একবার মূল্যায়নের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষণ শুরুর সময় থেকেই শিখনের শুরু এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। কাজেই প্রত্যেক অংশ শিক্ষণে শিখন কতটা হচ্ছে তা জানা জরুরী।

তাই শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন জরুরী। এই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন হবে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর ধারণাতেই এবং তা হবে শিক্ষার্থীর সমস্ত দিকের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই।

কাজেই প্রশ্ন হল এই মূল্যায়ন কখন হবে? নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হবে ধারাবাহিক; তবে নির্দিষ্ট ব্যবধান অবশ্যই থাকবে। কারণ একটি মূল্যায়ণের পরে শিক্ষক অগ্রগতি দেখবেন, তা লিপিবদ্ধ করবেন, মতামত প্রদান করবেন এবং কারণ অনুসন্ধান করে ত্রুটি দূর করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

এই পদ্ধতি হতে পারে দুভাবে ঃ

(১) প্রত্যেকদিন ঃ এক্ষেত্রে শিশুকে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষক সম্পর্কে করে তার পরিমাপ করবেন।

(২) মাঝে মাঝে ঃ এক্ষেত্রে শিক্ষক মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রাপ্ত তথ্যকে প্রতিফলনের (reflect) মাধ্যমে পরিবর্তন জানার চেষ্টা করবেন।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন শিশুর সমস্ত বছরের সব বিকাশের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং নথিভুক্ত করা হয়। এই নথিভুক্ত করণ দুভাবে করা হয়ে থাকে। প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়ক্রমিক।

(ক) প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation) :

শিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষক নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির দিকে নজর রাখবেন এবং শিক্ষক পরবর্তী শিক্ষণ সেভাবে ব্যবহার করবেন। এর জন্য বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করা যেতেপারে। এক্ষেত্রে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫, শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া চলতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এক্ষেত্রে যে সূচকগুলি ব্যবহার করেছেন তা হল ঃ

(১) অংশগ্রহণ (Participation),

(২) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান (Questioning and Experimentation),

(৩) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য (Interpretation and Application),

(৪) সমানুভূতি ও সহযোগিতা (Empathy and Cooperation)

(৫) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ (Aeothetic and Cretive Expression)

এই সূচকগুলির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপ করবেন। সমস্ত সূচক একদিনে প্রয়োজন নাও হতে পারে; তবে এগুলোর ব্যবহার প্রয়োজন মত হবে।

(খ) পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation) :

এই প্রকার মূল্যায়ন সাধারণতঃ গ্রেড দেবার জন্য ব্যবহার হয় এবং এটিও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের অন্তর্গত। এই মূল্যায়ন তিন-চার বার করা যেতে পারে।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন এর এই দুই পদ্ধতির মধ্যে দৃষ্টিগত এবং বিষয়গতভাবে পার্থক্য আছে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হল diagnostic এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হল judgemental।

২.৩.২. নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রকৃতি ও পরিধি ঃ

প্রকৃতি ঃ ছোট ছোট শিশু বিদ্যালয়ে আসে। প্রথমে বিদ্যালয় তার কাছে এক নতুন জগৎ। এখানে বাড়ীর পরিচিত মানুষজন নেই; কিন্তু আছে তারই সমবয়স্ক অনেক খেলার সাথী। প্রত্যেকের হাটা, চলা, কথা বলা, তাকানো, পোষাক, ব্যবহার অন্যের মত নয়। শিশু এগুলো অভিযোজন করতে থাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকার কথাবার্তা তার বাড়ির লোকের থেকে ভিন্ন। শিশু তাও অনুকরণ করে। তাকে আদর করলে খুব আনন্দ পায়, প্রশংসা করলে ভালো লাগে, গর্ব বোধ করে। নিজেকে অন্যদের থেকে তুলনা

করতে শেখে। নিন্দে করলে শিশু কষ্ট পায়, অভিমান বোধ করে এবং নিজেকে আলাদা করে রাখে। শিক্ষক-শিক্ষিকা অনেক সময়ই বিদ্যালয়ে অনেক রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। একটি অভিজ্ঞতার উদাহরণ দেওয়া যাক্ ঃ

পরীক্ষায় শিশুদের নম্বর দেওয়া হয়েছে। শিশুদের নম্বর ১০ এর মধ্যে ৬ এর কাছাকাছি। কারিনা এবং শৈবাল ব্যতিক্রম। এরা পেয়েছে যথাক্রমে ৮ এবং ৩। শিক্ষক যখন এই নম্বর ঘোষণা করছিলেন, তখন অন্য শিশুরা শৈবালের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ফলে এর পর থেকে শৈবাল আর স্কুলেই আসতে চায় না। বাবা-মা বুঝিয়েছেন অনেক; তবুও সে আগের দিনের কথা ভাবলেই স্কুলে যেতে ভয় পায়।

এখন অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে আসে। এই নম্বর কি ভাবে দেওয়া হল? একটি পরীক্ষার নম্বর একজন শিশুর পরিমাপের পক্ষে যথেষ্ট কিনা? লিখিত পরীক্ষা বাদে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কি? শৈবাল রোজ স্কুলে আসে কিনা? এমনই আরো হাজারো প্রশ্ন। পরীক্ষার ফলাফলেতো এরও প্রতিফলন থাকা চাই। আবার অন্যদিকে, যদি দেখা যায় যে অন্য সব ক্ষেত্রে শৈবাল অনেকের থেকেই ভালো তবে এক্ষেত্রে এরকম ফল হল কেন? শিক্ষক এ বিষয়ে কি ভাবছেন? কি পরিকল্পনা করছেন? শৈবাল কি বলছে বা ভাবছে তা কি জানা হয়েছে?

এ সমস্ত বিষয় কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণে থাকবে। মূল্যায়ণের পদ্ধতি হিসাবে ঃ

একক দলগত সহপাঠীদের দ্বারা এবং শিক্ষার্থীর নিজের দ্বারা এই সমস্তই ব্যবহার হয়।

মূল্যায়নের তথ্য পাবার জন্য পিতা-মাতা/অভিভাবক, শিশুর বন্ধু/সহপাঠী; অন্যান্য শিক্ষক বা প্রতিবেশীদের প্রদত্ত তথ্যও ব্যবহার করা হতে পারে।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি হলো ঃ

(ক) প্রত্যেক শিশুকে যদি তার নিজস্ব গতি এবং পদ্ধতিতে শিখতে দেওয়া হয় তবে সকলেই শিখতে পারে।

(খ) শিশু খেলাধূলা এবং সক্রিয়তার মাধ্যমে বেশী শিখতে পারে এবং পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমেও শিশুর শিক্ষা হয়।

(গ) যেহেতু শিখন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাই বিদ্যালয়ের বাইরেও তার শিখন হয়। কাজেই বিদ্যালয়ের শিখন কে বাড়ী বা সমাজের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা দরকার।

(ঘ) শিশু নিজের জ্ঞান নিজে তৈরী করতে পারে। কাজেই এটা ভাবা ঠিক নয় যে শিশু কেবল মাত্র শিক্ষকের কাছেই শিখতে পারে। অর্থাৎ শিশু পূর্বের জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন ভাবনা সৃষ্টি করে নিজের সিদ্ধান্ত নেয়। এটাই হ'ল নির্মিতি বাদের ভিত্তি।

(ঙ) প্রাথমিক স্তরে শিশু নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাল শিখতে পারে। আর এই অভিজ্ঞতা প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

(চ) শিশুর শিক্ষণ রৈখিক নয়, চক্রাকার। বারবার দেখে, ভুল করে, আবার চেষ্টা করে। এইভাবেই শিশুর নিজের শিক্ষা এগিয়ে চলে।

কাজেই নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে এ সমস্ত কিছু শিক্ষক জানতে পারেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

পরিধি ঃ

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের পরিধি ব্যাপক। কারণ এখানে কেবল একটি বা দুইটি পরীক্ষার দ্বারাই শিশুর অগ্রগতির পরিমাপ হয় না। বরঞ্চ শিশুর প্রত্যেক দিনের কাজ, আচার আচারণ, অভ্যাস, অভ্যাসের

পরিবর্তন, শিখনের অগ্রগতি এবং পদ্ধতি ইত্যাদি। কাজেই নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের পরিধি জানতে হলে প্রথমেই জানা দরকার সাধারণ মূল্যায়ন থেকে এর ফারাক কতটা এবং কোথায়? এবারে আসা যাক এ বিষয় আলোচনাতে। নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের অভিমুখ নিম্নরূপ ঃ

(১) মূল্যায়ন কেবল মাত্র বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নে শিশুর সমস্ত দিকের অগ্রগতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(২) এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিমাপই করা হয় না; বরঞ্চ পরিমাপ পদ্ধতির উন্নত কারণের কথাও ভাবা হয়।

(৩) এতে শুধুমাত্র গুণগত মূল্যায়ণেরই পরিমাপ হয় না, গুণগত এবং পরিমাপগত উভয় প্রকার পরিমাপেরই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৪) কেবলমাত্র কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার না করে আরো অনেক রকম পদ্ধতি মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

(৫) শিশুকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে মনে করে তার অগ্রগতির কথা ভাবা হয়।

(৬) এখানে মূল্যায়ন এবং শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিকে একই সঙ্গে কার্যকর করা হয়।

অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের পরিধি অনেক ব্যাপক।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের শিশুর যে সমস্ত দিকগুলির মূল্যায়ন করা হয় তা হল ঃ

- স্বাস্থ্যের অবস্থা
- লেখাপড়ায় অগ্রগতি
- ব্যক্তিগত এবং সামাজিক গুণাবলী
- আগ্রহ
- প্রবণতা
- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে দক্ষতা
- মূল্যবোধ
- আত্মসচেতনতা
- সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (বয়স অনুসারে)
- সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা
- জটিল ভাবনা করার ক্ষমতা
- বাড়ী, সমাজ এবং বিদ্যালয়ের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক এরকম আরো অনেক গুণাবলী।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—৫ (Check your Progress—5)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনীতে ৪৫ নং ধারায় কি বলা হয়েছে?

খ) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিন।

গ) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের একটি উদ্দেশ্য লিখুন।

২.৪ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের লক্ষ

শিক্ষার লক্ষ শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিকশিত করা। পরিপূর্ণ মানুষের অর্থ দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই সমান ভাবে পরিপুষ্ট হওয়া। কাজেই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক শিক্ষার লক্ষ হল ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ কতটা হয়েছে, আরো কতটা দরকার, সেটা কিভাবে সম্ভব তার সমস্ত দিক দেখা, মূল্যায়ন করা, চিহ্নিত করা এবং সঠিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করা। এই সমস্ত কাজ পরিবার বা শুধুমাত্র সমাজের দ্বারা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন শিশুর বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ে নিরাপদ, সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ তাই শিশুর জন্য প্রয়োজন। এতে শিশু সহজেই শিখবে এবং শিক্ষার গতিও ত্বরান্বিত হবে। তবে এজন্য শিশুর বিদ্যালয়কেও কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিবর্তন কি? বিদ্যালয়ে সিশুরজন্য রাখতে হবে শিখনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, শিক্ষা সহায়ক উপাদান সামগ্রী, শিশুর চলাফেরা-খেলাধূলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান ইত্যাদি। অর্থাৎ শিশুর বিদ্যালয়ের পরিবেশকেই পাল্টে করতে হবে শিশুর আনন্দের জায়গা। তবেই সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব। এর জন্য শিশুর শিক্ষাকে শিক্ষক কেন্দ্রীক পদ্ধতির থেকে শিশু কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বে শিক্ষক বলতেন শিক্ষার্থী বিনা প্রশ্নে শুনত এবং শিখত; শিক্ষক নির্দেশ দিতেন এবং শিক্ষার্থী সেই নির্দেশ অনুসারে তাঁকে অনুসরণ করত। এই পদ্ধতিই হল শিক্ষক কেন্দ্রীক পদ্ধতি।

কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক এবং শিশু উভয়েরই সহযোগিতায় শিখন কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। NCF-2005 এবং NCFTE-2009 এর নির্দেশে শিখন কার্য্যকে আরো শিশুকেন্দ্রীক করার জন্য নির্মিতিবাদের কথা বলা হয়েছে।

এখন আসা যাক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কি তা একটু বোঝার চেষ্টা করা। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা আগে বলা হয়েছে। এখন আমরা জানব এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ঃ

এই ক্ষেত্রে—

- শিক্ষক শিখনের সুযোগ তৈরী করে দেবেন এবং অর্থপূর্ণ শিখনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবেন;
- শিক্ষক শিশুকে শিখনের পরিবেশ তৈরী করে দেবেন যাতে শিশু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, প্রশ্ন, অভিজ্ঞতা এবং নিজেদের ধারণার ভিত্তি তৈরী করতে পারে।
- শিশুরা বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

- বিদ্যালয়ের বাইরে এবং ভিতরে শিশু যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তার উপর ভিত্তি করেই সে তার নিজের জ্ঞানের নির্মাণ করে।
- শিশু একক বা দলবদ্ধভাবে কাজ করে, আলোচনা করে, একে অন্যের সঙ্গে মত বিনিময় করে শিখন কাজ সম্পন্ন করে।
- শিশুর চাহিদা মত সময় সারণীকে তৈরী করা হয়।
- শিশুদের শ্রেণীকক্ষে কাজের উপযোগী করে বসার পদ্ধতির বিন্যাস করা হয়।
- শিখনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া যায়।সেগুলি শিশুর শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়।
- শিশুর কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া।
- শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে পরিমাপ একটি পদ্ধতি।
- শিশুদের কাজের মধ্যেই, তাদের পরিমাপ করা হয়।
- এই পরিমাপ রিপোর্টের আকারে পরিমাপ করা হয়।
- শিশুর অগ্রগতি গুণগত ভাবেও রিপোর্টে রাখা হয় এবং ঐ রিপোর্টে শিশুর বিকাশের সমস্ত দিকের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর লিখিত পরীক্ষার উপর বেশী জোর দেওয়া হয় না; বরং এখানে শিশুর সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার উপর গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয়। এই সময় বিভিন্ন অভ্যাস গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে পরবর্তী জীবনে শিশুর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

প্রারম্ভিক শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কমিটির ঘোষণায় বলা হয়েছে :

(i) To develop capacities and healthy physical growth of the child through play activities.

(ii) To help the child develop good social habits as an individual and as a member of the society.

(iii) To develop moral values in the child.

(iv) To enrich the child's experience by developing imagination self reliance and thinking power.

(v) To help the child towards appreciating his/her national cultural background and customs and developing a feeling of love and care for other people and a sense of unity leading to national harmony.

(vi) To develop language and communication skills in mother tongue."

আমাদের সকলেরই প্রধান লক্ষ শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শিখনের ব্যবস্থা করা। এই শিক্ষণ অবশ্যই উন্নত গুণমান যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তবে কি ভাবে তা হবে এ বিষয়ে নানা মত থাকতেই পারে। কিন্তু লক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের লক্ষ কিন্তু একই। সেগুলি হল ঃ

(ক) নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি সত্তায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর শিখন, উন্নতি এবং পরিবর্তনে কি প্রভাব পড়েছে তা দেখা;

(খ) ব্যক্তিগত চাহিদা, বিশেষ চাহিদা এবং অন্যান্য চাহিদার ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা;

(গ) শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা আরো সংগঠিতভাবে করা;

(ঘ) শিশুকে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখানো সে কি চায়, কি চায় না, কোনটি তার ভাল লাগে বা কোনটি তার ভাল লাগে না।

(ঙ) শিক্ষণের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা জানা, বোঝা এবং পরিমাপ করা;

(চ) শিশুর উন্নতিকে প্রমাণ সহ অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্যদের জানানো;

(ছ) পরীক্ষার প্রতি ভীতি দূর করা সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

(জ) প্রত্যেক শিশুকে তাদের নিজের মত করে সাহায্য করা;

(ঝ) শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বোধ বাড়ানো।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—৬ (Check your Progress—6)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) শিক্ষার লক্ষ্য কি?

খ) সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব কি ভাবে?

গ) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

২.৫ সারসংক্ষেপ

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীতে ২১ক ধারায় যুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু ঐ ধারাটি মৌলিক অধিকারের সাথে যুক্ত তাই এই বিষয়টির গুরুত্ব বর্তমানে বেশী। তবে ঐ ধারায় ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সিশুদের কথাই বলা হয়েছে।

অন্যদিকে সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

রাষ্ট্র শিশুর ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তাদের প্রতি যত্ন এবং শৈশব কালীন শিক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের গুরুত্ব এখানেই। ১৯৮৯ সনে ইউ.এন. কনভেনসনে শিশুর অধিকারের সন্দ গৃহীত হয়। ভারত সরকার ঐ সনদে ১৯৯২ সনে সাক্ষর করেন। ভারত সরকার প্রকাশিত NCPCR এ শিশুবিকাশের নির্দেশাবলী দেওয়া হয়। নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন সরকার এবং সংবিধান নির্দেশিত শিশুর পূর্ণ বিকাশ জন্যই বর্তমানে এত গুরুত্বপূর্ণ।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় ঃ মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা এবং শিখন ও আচরণগত পরিবর্তনের পরিমাপ; এই পরিমাপ হবে ধারাবাহিকভাবে সম্ভব হলে প্রতিদিন। এই মূল্যায়নে দুটি শব্দের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক। নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকেতদুভাগে ভাগ করা হয় ঃ প্রস্তুতিকালীন (Formation) এবং পর্যায়ক্রমিক (Summative)। কাজেই বলা যেতে পারে নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রকৃতি অন্য প্রকার মূল্যায়ন থেকে একটু স্বতন্ত্র এবং এর পরিধি অনেকটাই ব্যাপক।

যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বয়স ছয় এর কম, তাই এখানে শিশুর মূল্যায়নের লক্ষও অন্যান্য স্তরে থেকে একটু পৃথক। এখানে শিশুর ইন্দ্রিয় বিকাশের উপর নজর একটু বেশী দেওয়া হয়। তাই এদিকে লক্ষ রেখে পাঠক্রমে গঠন এবং তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। যে মূল্যায়ন তালিকা শিশুকে দেওয়া হবে তাতে সিশুর ধারাবাহিক বিকাশের গুণগত এবং পরিমাণগত মাপ দেওয়া থাকবে যাতে বিদ্যালয়, অভিভাবক এবং শিশু নিজেও তার অগ্রগতি বুঝতে পারবে। শিক্ষক এবং অভিভাবক দৃষ্টি দিতে পারবেন শিশুর আরো অগ্রগতি কি ভাবে করা সম্ভব।

২.৬ অনুশীলন

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ১৫০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) ১৯৮৯ সনের U N Convention শিশুর কি কি অধিকার স্বীকৃত হয়েছে?
(ii) ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিশুর কোন কোন দিকের পরিমাপ করা যায়?
(iii) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন কিভাবে হতে পারে লিখুন।
(iv) শিশু শিক্ষায় নির্মিতিবাদের কথা বলা হয়েছে কেন?

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৩০০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) এই মূল্যায়নে শিশুর কোন কোন দিকের মূল্যায়ন করা হয়?
(ii) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়?
(iii) এই মূল্যায়নের তিনটি লক্ষ্য লেখ।
(iv) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৫০০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন কেন প্রয়োজন?
(ii) নিরবচ্ছিন্ন সার্বকি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি লিখুন।
(iii) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের দুটি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
(iv) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর সংকেত

উত্তর সংকেত—৫

(ক) রাষ্ট্রশিশুর ৬ বৎসর পর্যন্ত যত্ন এবং শৈশবকালীন শিক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

(খ) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের পরিমাপ করা হয়।

(গ) প্রজ্ঞামূলক, মানসিক সঞ্চালন মূলক এবং অনুভূতিমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটানোয় সাহায্য করা।

উত্তর সংকেত—৬

(ক) সার্বিক বিকাশ।

(খ) শিশুর জন্য শিখনের জিনিসপত্র, খেলাধূলার সামগ্রী ইত্যাদি।

(গ) শিক্ষক শিখনের সুযোগ তৈরী করে দেবেন এবং অর্থপূর্ণ শিখনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবেন।

একক ৩ ❑ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE in Pre-primary education)

গঠন **(Structure)**

৩.১ সূচনা **(Introduction)**

৩.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৩.৩ বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন **(Scholartic Evaluation)**

৩.৪ সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন **(Co-scholartic Evaluation)**

৩.৫ প্রস্তুতি কালীন মূল্যায়ন **(Formative Evaluation)**

৩.৬ পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন **(Summative Evaluation)**

৩.৭ সারসংক্ষেপ

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর

৩.১ সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা জেনেছি এই নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়ন কি, কেন এবং কখন। এই মূল্যায়নের প্রকৃতি এবং পরিধি। এই অংশে আমরা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় এই প্রকার মূল্যায়নের লক্ষ নিয়েও আলোচনা করেছি।

এই অধ্যায়ে আমরা নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। এর মধ্যে আছে বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন। সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন। প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়কালীন মূল্যায়ন।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায় শেষে আপনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে, বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারবেন :

- বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন কি এবং কেন?
- সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন কি এবং কেন?
- প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন কিভাবে এবং কেন?

৩.৩ বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন (Scholartic Evaluation)

বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে বিষয় ভিত্তিক বা সহবিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় বিষয় বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব বা প্রয়োগ কম হলেও তা জানা প্রয়োজন। কারণ মূল্যায়ণ যাতে একপেশে না হয়ে সম্পূর্ণ করার জন্য বিষয় ভিত্তিক এবং সহ-বিষয় ভিত্তিক উভয় প্রকার মূল্যায়ণই করা দরকার। এবার আসা যাক বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের আলোচনায়। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং ধারণার বিকাশ প্রত্যাশিত আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ এবং ঐগুলি অপরিচিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ক্ষমতাই বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যের মধ্যে গ্রহর করা হয়।

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ধারণা, প্রয়োগ, মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন এবং ঐগুলি নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন;
- শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো;
- মূল্যায়ন হবে প্রস্তুতিকালীন (Formative) এবং পর্যায়ক্রমিক (Summative)

প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা করা হবে।

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি :

বিভাগ - ক	বিভাগ - খ
ভাষা	কলা শিক্ষা
গণিত	কর্মশিক্ষা
শুদ্ধ বিজ্ঞান	স্বাস্থ্য শিক্ষা
সমাজ বিজ্ঞান	কম্পিউটার শিক্ষা

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নের বিভিন্ন অংশগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে :

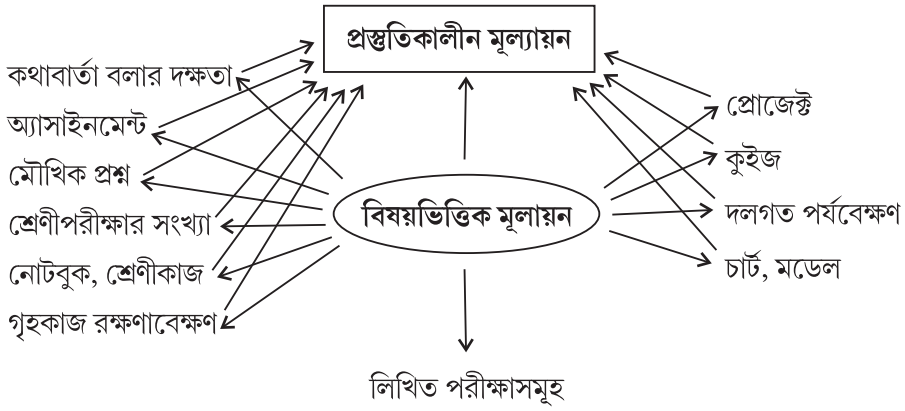

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের কৌশলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ১) প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন এবং ২) পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এর জন্য যে সমস্ত টুল এবং কৌশল ব্যবহার করা হয় সেগুলি নিম্নরূপ :

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ণ (সময় নির্দিষ্ট নয়)		পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (লিখিত পরীক্ষা, সময়ভিত্তিক পরীক্ষা)
টুল	কৌশল	● অবজেকটিভ প্রশ্ন
● প্রশ্ন	● পরীক্ষা	● খুব ছোট প্রশ্ন
● পর্যবেক্ষণ	● অ্যাসাইনমেন্ট	● ছোট প্রশ্ন
● ইন্টারভিউ সিডিউল	● কুইজ এবং প্রতিযোগিতা	● বড় প্রশ্ন
● চেকলিস্ট	● প্রকল্প	
● রেটিং স্কেল	● বিতর্ক	
● অ্যানেকজেটাল রেকর্ড	● আবৃতি	
● তথ্য বিশ্লেষণ	● দলগত আলোচনা	
● টেস্ট এবং ইনেভেন্টরি	● ক্লাব এর কাজকর্ম	
● পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ	● পরীক্ষা	
	● গবেষণা	

এবারে আমরা খুব সংক্ষেপে এই টুল এবং কৌশলগুলি এবং এদের সুবিদা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করব।

A. প্রশ্ন :

সব থেকে প্রচলিত পরিমাপের ব্যবহৃত টুল হল প্রশ্ন। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিশুর জানা, ভাবনা, কল্পনা, অনুভব, অনুভূতি ইত্যাদি জানা যায়। একটি ভাল প্রশ্নগুচ্ছের বিভিন্ন গুণ হতে পারে :

i) প্রশ্নগুছে নৈর্ব্যক্তিক হবে— অর্থাৎ প্রশ্নগুচ্ছে তৈরীর আগে এর উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে হবে এবং প্রশ্ন ঐ উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে প্রশ্নগুচ্ছ তৈরী করতে হবে।

ii) নিদের্শনা— সঠিক নির্দেশনা থাকা দরকার।

iii) বিষয় বস্তু— প্রশ্ন বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করে হবে।

এছাড়া ভাষা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, উত্তরদানের নির্দেশনা, ইত্যাদিও থাকবে।

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করাও হবে; এর মধ্যে থাকবে

ক) স্মরণ ধর্মী প্রশ্ন (Remembering)

খ) বোধযুক্ত প্রশ্ন (Understanding)

গ) প্রয়োগ (Applying)

ঘ) বিশ্লেষণ মূলক (Analysing)

ঙ) মূল্যায়ন মূলক (Evaluation)

চ) সৃজন মূলক (Creating)

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন :

শব্দ সংখ্যা, উত্তরের প্রকৃতি অনুসারে প্রশ্নকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হয় :

i) খুব ছোট উত্তর (নৈর্ব্যক্তিক) ii) খুব ছোট উত্তর iii) ছোট উত্তর ও iv) রচনা ধর্মী প্রশ্ন।

এই প্রশ্নগুলিকে আবার অনেক রকমে, অনেক ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। আমরা এখানে কেবল মাত্র নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধরনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব :

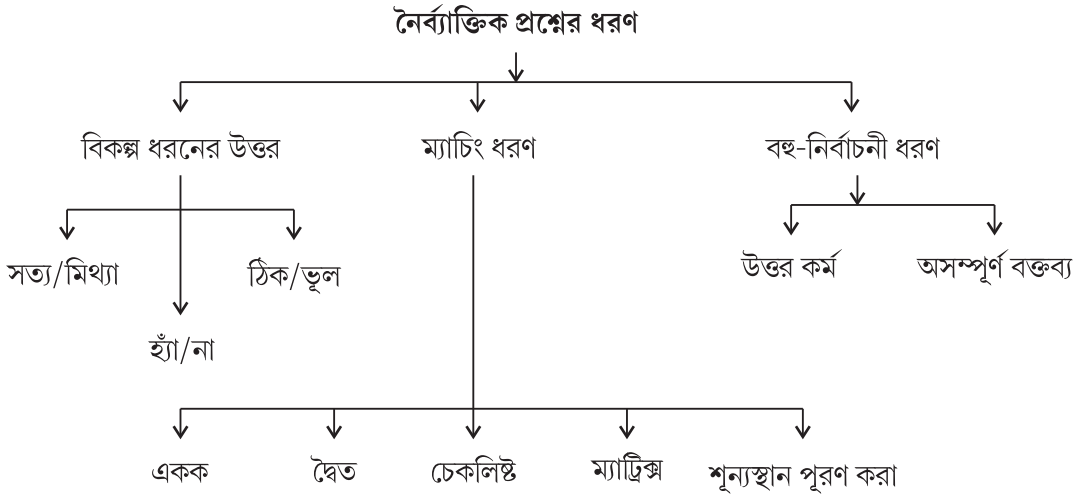

B. পর্যবেক্ষণ :

শিশুর সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য প্রকৃত পরিস্থিতিতে সংগ্রহ করা যায়। এই সংগ্রহ হতে পারে বিদ্যালয়ের বাইরে অথবা বিদ্যালয়ের ভিতরে। আবার বিদ্যালয়ের ভিতরেও তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রেণী কক্ষের ভিতর এবং শ্রেণী কক্ষের বাইরেও সম্ভব। শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিশুর আচার-আচরণ, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা, চলাফেরা, হাবভাব, কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমেও জানা যেতে পারে। এই তথ্য সংগ্রহ পরিকল্পিত ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও সম্ভব।

পর্যবেক্ষণের সুবিধা :

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে অনেকগুলি সুবিধা আছে। যেমন :

ক) শিশুর ব্যক্তি সত্তার বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি চিহ্নিত করা এবং নির্দেশিত করা যায়।

খ) শিশুকে একক বা দলগত ভাবে চিহ্নিত করতে পারা যায়।

গ) বিভিন্ন সময় পর্যায়ে চিহ্নিত এবং নির্দেশিত করা যায়।

ঘ) নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর অগ্রগতি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন করা যায়।

ঙ) বিভিন্ন সময় পর্যবেক্ষণের ফল সময় ভিত্তিক শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময় ধরে পরিমাপ করা যায়।

পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা :

পর্যবেক্ষণের কতগুলি ত্রুটি আছে। যার ফলে পর্যবেক্ষনের অনেক সুবিধা থাকলেও এর উপনীত সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই ঠিকনা হতেও পারে। কতগুলি সীমাবদ্ধতা হল :

ক) দু-একটি পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়;

খ) পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট কৌশল জানা না থাকতেও পারে;

গ) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির নির্ভর যোগ্যতা এবং নৈর্ব্যাক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ;

ঘ) একটি পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ অন্য পরিস্থিতিতে সঠিক না হতেও পারে;

ভ) ফলাফল বিশ্লেষণ পদ্ধতি সঠিক না হতেও পারে;

কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণ নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিতর্ক, বক্তৃতা, দলগত কাজ, হাতে কলমে কাজে, প্রবেষ্ট এর কাজে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত ত্রুটিগুলোর কথা উপরে বলা হয়েছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ-এর পূর্ব প্রস্তুত তালিকা ব্যবহার করে অনেকটা কমানো যেতে পারে। নীচে কয়েকটি ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের ব্যবহার দেখানো হল।

(i) বিতর্ক সভা :

বিতর্কসভার যোগদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উৎকর্সতা কতটা তা পরিমাপের জন্য নীচের তালিকা ব্যবহার করা যেতে পারে :

ক্রমিক সংখ্যা	গুণাবলীর বিবরণ	মূল্যমান				
		১	২	৩	৪	৫
১.	বিষয় বস্তুর জ্ঞান					
২.	যুক্তিদানের ক্ষমতা					
৩.	দ্রুততা, উচ্চারণ এবং বাচন ভঙ্গী					
৪.	অন্যের যুক্তি খণ্ডন করার ক্ষমতা					
৫.	সমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষমতা					
৬.	বিরোধীদের প্রতি সহিষ্ণুতা					
৭.	যুক্তিদেবার সময় দৈহিক ভাষা					

(ii) দলগত আলোচনা :

যে সমস্ত বিষয়ের উপরে এই পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে তা হল :

ক্রমিক সংখ্যা	গুণাবলীর বিবরণ	মূল্যমান				
		১	২	৩	৪	৫
১.	আলোচনায় অবদান					
২.	বিষয় বস্তুর জ্ঞান					
৩.	আলোচনায় অন্যকে যুক্ত করার ক্ষমতা					
৪.	নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা					
৫.	সমালোচনাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা					
৬.	সৃজন শীলতার প্রয়োগ					
৭.	অন্যদের বক্তব্য শোনার ক্ষমতা— ইত্যাদি					

(গ) পরীক্ষা এবং ইনভেনটারি :

পরীক্ষাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা। খুবই কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষাই অধিক ব্যবহার যোগ্য। এই পরীক্ষায় একক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হয়; তাই এতে সময়ও বেশী লাগে। কিন্তু অন্যদিকে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে পরিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া যায়। আবার যে সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার অসুবিধা থাকে সেখানেও এই চেষ্ট ব্যবহার করা হয়।

এই পরীক্ষা ব্যবহার করার আগে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কারণ যে সমস্ত প্রশ্ন করা হবে তার প্রয়োজন, গুরুত্ব, কাঠিন্য ইত্যাদি দেখার প্রয়োজন। প্রশ্ন কাঠিন্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে সাজাতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর, কতনম্বর দেওয়া হবে, কি ভাবে উপস্থাপন করা হবে তা পরীক্ষকের কাছে পরিষ্কার হতে হবে এবং প্রশ্নের সঙ্গে এগুলোও লিখিত ভাবে থাকবে।

এই পদ্ধতির নৈর্ব্যাক্তিকতা রক্ষা করার জন্য উত্তরকে রেকর্ড করে রাখতে হবে। উত্তরের সঙ্গে মডেল উত্তর মিলিয়ে নম্বর বা গ্রেড দিতে হবে। এই ধরনের রেকর্ড করা উত্তরের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত নোট থাকলে ভাল হয়। এর ফলে যখনই কেউ এই প্রশ্ন ব্যবহার করবে তখনই উত্তর দানের পদ্ধতি একই হবে।

(ঘ) চেকলিষ্ট :

চেকলিষ্টের মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশের পরিমাপ করা সম্ভব। এখানে বিভিন্ন পরিমাপ যোগ্যগুণাবলী লিখিত আকারে থাকবে এবং শিক্ষক প্রত্যেকটি গুণাবলীর ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তরে টিক

চিহ্ন দেবেন। যেমন 'জীবন শৈলী' চেকলিষ্টের মাধ্যমে পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্র নির্দেশিত করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদা ভাবে পরিমাপ করা হবে।

তবে চেকলিষ্টে পূর্বে তথ্য সংগ্রহ করে পরে চেকলিষ্টের প্রয়োজন মত উত্তরে দাগ দেওয়া যেতে পারে। কাজেই চেকলিষ্টকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ এবং তা লিপিবদ্ধ করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ঙ) রেটিং স্কেল :

এটি ধারাবাহিক পরিমাপের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে স্কেলে একটি ধারাবাহিকতা থাকে। এক্ষেত্রে পরিমাপ করার জন্য সবথেকে ভাল থেকে খারাপ এই ধারাবাহিকতায় প্রশ্নকর্তা তৈরী করে রাখবেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একই রেটিং স্কেল পৃথক ভাবে ব্যবহার করা হবে।

(চ) অ্যানেকডোটাল রেকর্ড :

'অ্যানেকডোটাল' কথাটির এসেছে 'অ্যানেকডোট' থেকে। অ্যানেকডোটের অর্থ ঘটনা বা উপাখ্যান। এই রেকর্ডের সাহায্যে শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই কৌশলে শিক্ষার্থীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্নদিক যেমন : আচরণ, চিন্তন, দক্ষতা এবং ব্যক্তিসত্ত্বার বিভিন্ন দিকগুলি জানা যায়।

তবে এক্ষেত্রে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা যথেষ্ট নয়; কারণ একটি ঘটনার মাধ্যমে শিশুর সমস্ত দিকের প্রকাশ না হতেও পারে। প্রত্যেক ঘটনায় শিক্ষক একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাঁর মন্তবয লিখে রাখবেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

শ্রেণী কক্ষে একদিন—

আমি ক্লাশে ঢুকলাম, বাচ্চারা খুবই আনন্দিত। তারা উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমি দেখলাম আজ এখন বাচ্চারা পড়তে চায়না। আমি তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে খেলতে বললাম। বাচ্চারা দৌড়ে, লাফিয়ে, চেচিয়ে খেলতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি বাচ্চা, সেবন্তি, খেলায় যোগ দেয়নি। সে ক্লাশে বসে তার ছবি আঁকার খাতায় ছবি আঁকছে। আমি কৌতুহলী হয়ে সেবন্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি খেলতে যাওনি কেন?" সেবন্তি ভয় পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'আমার খেলতে ভাল লাগেনা। আমার ছবি আঁকতে খুব ভাল লাগে।"

শিক্ষকের মন্তব্য :

সেবন্তি বুদ্ধিমতী, শান্ত, বাধ্য। সে খেলতে, ছুটতে চায় না। অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা বেশী পছন্দ করে না। তার মধ্যে ছবি আঁকার গুণ আছে। সেবন্তি কল্পনা প্রবণ, প্রকৃতির ছবি এঁকেছে; সে প্রকৃতিকে ভালবাসে।

অ্যানেকডোট কটা হবে? এটা নির্ভর করে কতটা সময় পাওয়া যাবে এর উপরে তবে এই রেকর্ড তৈরী করার সময় কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে :

- অ্যানেকডোটাল রেকর্ডকে অন্য তথ্যপঞ্জির বিকল্প ভাবলে হবে না;
- শিক্ষক বিষয় ভিত্তিক মন্তব্যকে নৈর্ব্যাক্তিক মন্তব্যের সঙ্গে এক করে ফেলবেন না;
- যে কোন বিশেষ আচরণ তা ক্লাশের মধ্যে, ক্লাশের বাইরে বা অন্য কোথাও হক তা লিপিবদ্ধ করতে হবে;
- শিশুর আচরণ তা ভাল, মন্দ, মাঝারি যাই হোক না কেন লিপিবদ্ধ করতে হবে;
- সমস্ত মন্তব্যগুলিকে একত্র করে তা বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে;
- এই তথ্যপঞ্জী কিন্তু খুবই গোপনীয় কাজেই এগুলো যেন অন্য কোন ব্যক্তির হাতে না পড়ে।

অ্যানেকডোটাল রেকর্ড এর উদাহরণ:

বিদ্যালয়ের নাম :

শিক্ষার্থীর নাম : শ্রেণী :

পর্যবেক্ষক : সময়, তারিখ :

বিবরণ :

পর্যবেক্ষকের মন্তব্য :

অ্যানেকডোটাল রেকর্ডের ব্যবহার :

অ্যানেকডোটাল রেকর্ড বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি ব্যবহার নীচে দেওয়া হল:

i) ব্যক্তির নির্দিষ্ট আচরণ সম্বন্ধে জানা যায়;
ii) শিশুর বিভিন্নক্ষেত্রে আচরণ, চিন্তা এগুলো জানা যায়;
iii) ধারাবাহিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা যায়;
iv) শিশুর নিজের পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়;
v) শিশুর প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাথমিক স্তর বা এক স্কুল তেকে অন্য স্কুলে যাবে তখন এটি প্রয়োজনীয়;
vi) নতুন শিক্ষক ছাত্রদের তথ্য এর মাধ্যমে জানতে পারে;
vii) অনেক সময় চিকিৎসকের কাছেও এই তথ্য প্রয়োজনীয়;
viii) শিক্ষার্থীর দলগত আচরণ বোঝা যায়।

(ছ) তথ্য পঞ্জী (Porftolio) :

তথ্যপঞ্জীতে শিশুর কয়েক দিন বা অনেক দিনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই তথ্যে সবথেকে ভাল কাজগুলিকে সাধারণত: সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যপঞ্জীর সুবিধা—

তথ্য পঞ্জীর অনেকগুলি সুবিধা আছে। তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

i) এবদ্বারা শিশুর কোন দক্ষতার বিকাশ এবং বৃদ্ধির হার জানা যায়;

ii) শিশুর শিখন এবং অগ্রগতি অন্যদের কাছে বলতে, করতে এবং দেখাতে পারে তা জানা যায়;

iii) শিশু নিজেই শিখন এবং পরিমাপ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে কিনা তা জানা যায়।

তথ্যপঞ্জীর কিছু সমস্যা—

i) নির্দিষ্ট কারণে কিছু নির্দিষ্ট কাজ তথ্যপঞ্জীতে সংগ্রহ করার হয়;

ii) সমস্যা ঘটনা/কাজের তথ্য সংগ্রহ করা হয়না; কারণ তা শিক্ষকের তথ্যপঞ্জী পরিচালনের কাজে সুবিধা জনক হয়না;

iii) প্রদত্ত ঘটনা অন্য শিক্ষক সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে নাও পারেন।

তথ্যপঞ্জী উন্নত করণ :

- শিশুকেই তথ্যপঞ্জীতে কোন কেনা তথ্য থাকবে তার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। শিশুকেই বলতে হবে তথ্যপঞ্জীর তথ্য ব্যাখ্যা করার জন্য।
- তথ্যপঞ্জীকে ধারাবাহিক ভাবে উন্নত করা এবং নতুন তথ্য অন্তর্গত করা দরকার।
- তথ্যপঞ্জীর তথ্য যুক্ত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার;
- এতে প্রত্যেক তথ্যের স্পষ্ট সংখ্যা দেওয়া দরকার এবং প্রত্যেক তথ্যের শিশুর কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পর্কিত তা দেওয়া দরকার।

তথ্যপঞ্জীর মধ্যে কি কি থাকবে—

i) ছবি— শিশুর বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন কাজের সময়ের ছবি থাকবে। এরদ্বারা শিশুর প্রাক্ষোভিক, সামাজিক এবং মানসিক অবস্থা বোঝা যাবে।

ii) হাতে আঁকা ছবি ইত্যাদি— এরদ্বারা শিশুর শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ, দক্ষতা, চিন্তন, প্রবণতা ইত্যাদি বোঝা যাবে।

iii) অডিও এবং ভিডিও রেকর্ড— কিছু কিছু বিশেষ সময়, অবস্থান ইত্যাদি ভিডিও এবং অডিও রেকর্ড করে যুক্ত করে রাখতে পারলে

iv) নিজস্ব পরিমাপ— এতে শিশুর নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং পরিমাপ সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

যেমন শিশুকে খেলার পরে জিজ্ঞাসা করা হল— কি করলে আরো ভাল খেলতে পারতে?

v) সহপাঠীদের পরিমাপ— দলগত আচরণ জানার ক্ষেত্রে এই প্রকার তথ্য খুবই জরুরী। এরদ্বারা শিশুর সম্বন্ধে তার সহপাঠীদের মনোভাব জানা যায়। শিশুর সামাজিক জীবন এবং তার বিভিন্ন দক্ষতা এরদ্বারা জানা যাবে।

vi) পিতা-মাতা বা অভিবাবকদের দ্বারা পরিমাপ— এগুলোর দ্বারা শিশুর বাড়ীতে বা পাড়ায় বিভিন্ন কাজ এবং আচরণের তথ্য পাওয়া যায়। শিশুর ধারাবাহিক মূল্যায়নে এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

(জ) কর্মভার (Assingment) :

এই প্রকার কার্যাবলী বিভিন্ন কারণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কখনও শিশুর কোন পাঠ শেষ হবার পরে তার অগ্রগতি পরীক্ষার জন্য, কখনও অন্যকোন কাজ দেওয়া যার সাহায্যে শিশুর কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ধারণার অগ্রগতি জানা যায়।

কর্মভার এর সুবিধা—

- এরদ্বারা শিশুর নিজের নতুন ভাবন-চিন্তার প্রকাশ, নতুন ধারণার প্রতি আগ্রহ, তথ্য সংগ্রহের প্রতি ইচ্ছা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।
- নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।
- বিভিন্ন ঘটনা, স্কুলের বাইরে এবং ভিতরে, কিভাবে সম্পর্কিত তা জানতে পারে।

শিক্ষকের সতর্কতা—

তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকেরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তার কিছু হল—

- অনেক সময় শিক্ষক যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়েই অ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুত করেন।
- প্রদত্ত কাজগুলি এমন হতে হবে যা শিশু নিজেই করতে পারে।
- এই কাজকেই একমাত্র পরিমাপ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা চলবেনা।

প্রয়োগ বিধি—

- বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং পর্যালোচনার আরো গভীরে যেতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়াতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে উৎসাহ দতে হবে;
- দলবদ্ধ শিখনের কাজে উৎসাহ দিতে হবে।

এছাড়াও বির্তক সভা, প্রতিযোগীতাও এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-১ (Check your progress-1)

নির্দেশ : ক) আপনার উত্তর প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।

খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

i) বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের দুইটি উদ্দেশ্য লিখুন

---

ii) প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের দুটি কৌশল লেখ

৩.৪ সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন (Co-scholarstic Evaluation)

শিক্ষার্থীর শিক্ষনে অগ্রগতির পরিমাপ কেবল মাত্র কিছু পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞন পরিমাপের দ্বারাই বোঝা যাবেনা। এরজন্য এর সঙ্গে সঙ্গে সহ-বিষয় ভিত্তিক বিষয় সমূহেরও মূল্যায়ন করা দরকার। কিন্তু শিক্ষক অধিকাংশ সময়েই এই অংশটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না অথবা অবহেলা করেন। ফলে সার্বিক মূল্যায়ন কিন্তু আর সার্বিক হয় না।

সার্বিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করা দরকার কারণ পাঠক্রমিক এবং সহ-পাঠক্রমিক শিখনের মান জানতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করা দরকার। এরজন্য প্রথমে জানা দরকার সহ-বিষয় ভিত্তিক শিখনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা প্রয়োজন তা জানা এবং এর জন্য কৌশল নির্ধারণ করা। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক্ কোন কোন ক্ষেত্রে সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ :

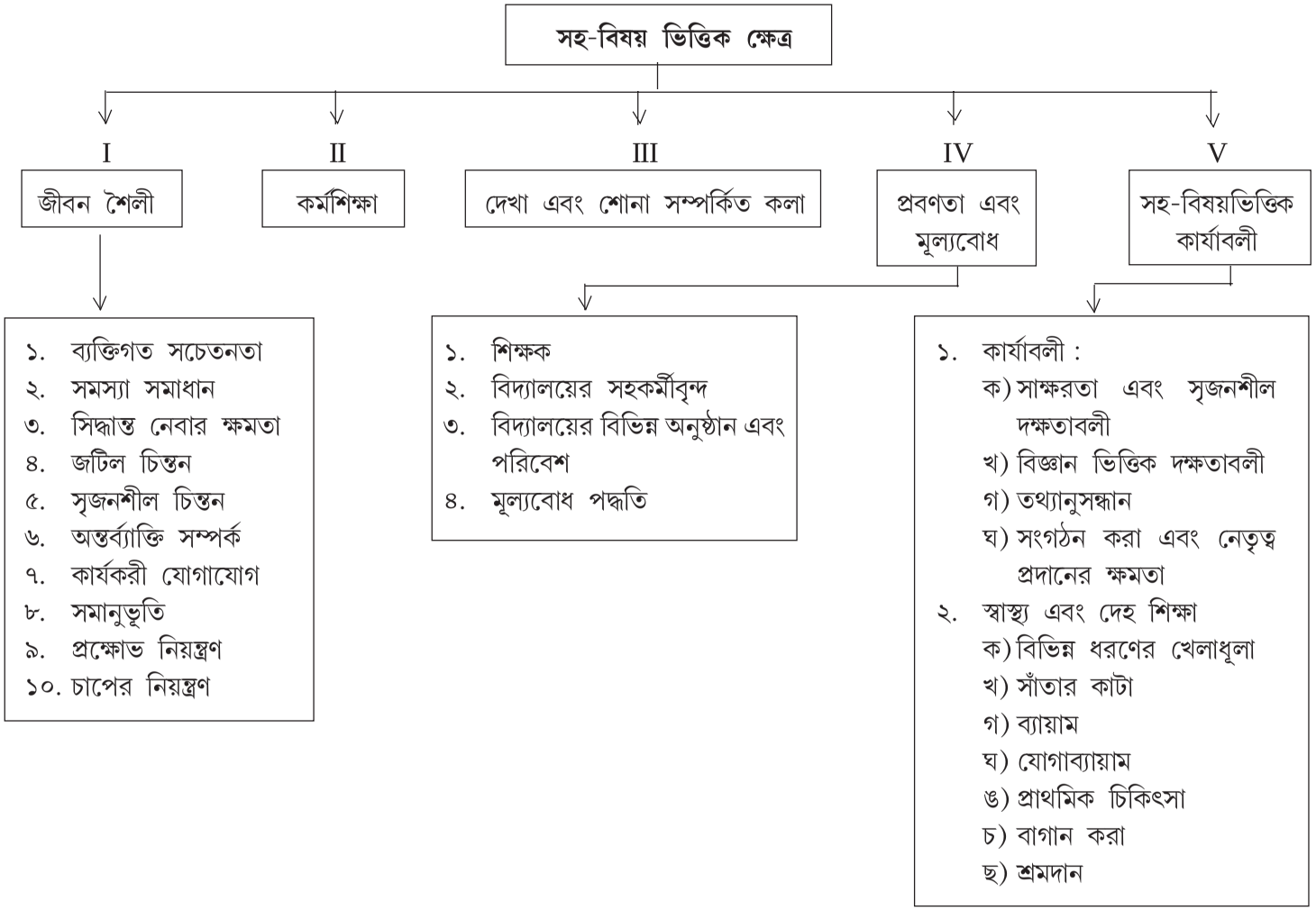

উপরের বিষয়গুলি সহ-বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলীর অন্তর্গত। তবে শ্রেণী এবং শিশুর বয়স অনুসারে কোনটি কখন নেওয়া প্রয়োজন তা ঠিক করতে হবে। যেমন জীবনশৈলীর কোন কোন অংশ কোন স্তরে নিতে হবে তা নির্বাচন করতে হবে। জীবন শৈলীর বিভিন্ন পাঠ শিশু বয়স

থেকেই নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে প্রবণতা এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। বিভিন্ন বিষয় দেখা, শোনা এবং তার প্রতিফলন ঘটানও শিশুর পক্ষে প্রয়োজন। এভাবেই সহ-বিষয় ভিত্তিক বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের সঙ্গে একই ভাবে প্রয়োজন।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-২ (Check your progress-2)

নির্দেশ : ক) একই নির্দেশ হবে।

খ)

i) সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের কাকে বলে?

---

ii) জীবন শৈলীর দুটি ক্ষেত্রের নাম লেখ—

সহ-বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা সমূহের মূল্যায়ন—

শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তন ঘটে। তবে সে পরিবর্তন কখনও প্রকাশ্য কখনও প্রকাশ্য নয়। যেমন শিশু একটি বিশেষ কাজ করতে পারে কিনা তা জানা যায় তার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে। শিশু একটি কবিতা বলতে পারে কিনা তাও জানা যায় তার কাজের মাধ্যমেই। কিন্তু কোন বিশেষ বিষয় তার কতটা ভাল লেগেছে তা কিন্তু কোন কাজের মাধ্যমে জানা নাও যেতে পারে। শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে যদি শিশুকে প্রশ্ন করা হয় 'কবিতাটি কেমন লেগেছে' এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। কারণ উত্তর 'ভাল', 'খুব ভাল', 'ভাল না' ইত্যাদি হলেও তার দ্বারা কিন্তু সঠিক মানসিকতা জানা যায় না।

আর একটি কথা মানুষ কিন্তু রোবট নয়; শিশুর ক্ষেত্রে তা আরো সত্য। শিশুর মন বহমান, পরিবর্তনশীল। কাজেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে বারবার প্রমাণ চাই এবং এই প্রমাণের জন্য ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। শিশু তার জীবনে কখনও আনন্দিত, কখনও দুঃখিত, কখনও ক্রুদ্ধ। কাজেই এর থেকে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে যে এখন শিশু ক্রুদ্ধ। কিন্তু যদি শিশু সবসময় সভ্য-ভদ্র আচরণ করে তবে লা যেতে পারে 'শিশুটি ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত'।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে শিক্ষক/শিক্ষিকা মূল্যায়ণ করবেন। এতে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত মত/ধারণা যুক্ত হতে পারে। কাজেই প্রাপ্ত ফলের মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে।

সহ-বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা সমূহের মূল্যায়নের ধাপ—

১। কোন কোন গুণ মাপতে হবে তার নির্ধারণ;

২। দক্ষতার পরিমাপের নির্দিষ্ট করা এবং সূচক নির্ধারণ করা;

৩। পরিদর্শন এবং অন্যান্য কৌশলের মাধ্যমে আচরণ বা সূচকের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা;
৪। তথ্য প্রমাণগুলি লিপি বদ্ধ করা;
৫। তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করা;
৬। তথ্য প্রমাণ ব্যাখ্যা করা এবং গ্রেড প্রদান করা।

এইভাবে প্রাপ্ত ফলের ধারা বাহিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের দ্বারা সহ-বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়ন সম্ভব।

প্রাপ্ত ফলাফরে উপর নির্ভর করে দক্ষতা বা আচররের গ্রেড প্রদান করা যেতে পারে। সহ-বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলির পরিমাপ মোটামুটি চারটি স্তর হবে;

i) প্রত্যেকটি বাহ্যিক আচরণমূলক সূচক এর ক্ষেত্র নির্ধারিত করা;

ii) পরিমাপের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

iii) তথ্য এবং প্রমাণ জানার জন্য কৌশল এবং টুল নির্বাচন করা;

iv) তথ্য সংরক্ষণ, তথয বিশ্লেষণ এবং সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

সহ-বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলির তালিকা আগেই দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা ঐ ক্ষেত্রগুলির একটি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

I. জীবনশৈলী (Life skills)

জীবনশৈলী হল দক্ষতা, যে দক্ষতা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সহবস্থান করতে শেখায় এবং প্রত্যাহিক জীবনের বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থার থেকে আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে উত্তরনে সাহায্য করে। এই দক্ষতাই দৈহিক, মানষিক এবং প্রাক্ষভিক ক্ষেত্রগুলিকে বিকশিত করতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জীবন শৈলীর প্রকাশ এবং প্রসার অত্যন্ত দরকারী। কারর জীবনশৈলীর অভ্যাসের দ্বারা শিক্ষার্থী তাদের নিজেদের এবং সামাজিক গুণের 'বিকাশ ঘটাতে' পারবে।

জীবন শৈলীর বিভাগ অনেক ব্যাপক ভাবে করা যেতে পারে। কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধভাবে এর প্রয়োগ করা হয় এবং এর তালিকা আগেই দেওয়া হয়েছে।

যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সব বা অধিকাংশগুলিই পরিমাপের জন্য পরিমাপ যোগ্য চেষ্টা বা ইনভেন্টরি আছে। আবার এর অনেকগুলোকে শিশু তার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতেও পারে। আমরা এখানে তিনটি পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করব। এর মাধ্যমে মূল্যায়নের নৈর্ব্যাক্তিকতা এবং নির্ভর যোগ্যতাও পরিমাপ করা যাবে :

i) প্রত্যেকদিন পর্যবেক্ষণ (Day to day observation)

ii) প্রত্যেক পর্যায়ে রেটিং করা (Rating per term)

iii) বাৎসরিক পরীক্ষা (Testing annually)

i) প্রত্যেক দিন পর্যবেক্ষণ :

এর জন্য শিক্ষক শিশুর উপর প্রত্যেকদিন নজর রাখবেন। কোন বিশেষ ঘটনা দেখলেই শিক্ষক তাঁর নিজের ডাইরীতে লিখে রাখবেন। ঘটনার উৎস, সময় ইত্যাদিও। সম্ভব হলে ফলাফলও লিখতে হবে। তবে এও মনে রাখা দরকার এটা কিন্তু কোন সময় ধরা কাজ নয়— যে কোন সময় ঘটতে পারে। কয়েকটি

উদাহরণ দেওয়া যাক :

- বিজিত তার টিফিন ভাগ করে খায়;
- রবিন তার টিফিন তাড়াতাড়ি খেয়ে অন্যের দিকে হাত বাড়ায়;
- কবিতা অনুষ্ঠানে কোন পুরস্কার না পেলেও হাসি মুখে সবসময় আমাকে সাহায্য করেছে;
- জয়া তার অসুস্থ বন্ধুকে বাড়ীতে দেখতে গেছে এবং তাকে ক্লাশের লেখা পড়া এবং বাড়ীর কাজের কথা জানিয়েছে;
- বেনু আমার সঙ্গে একমত হয়নি এবং তর্ক করেছে; কিন্তু কখনও উত্তেজিত হয় নি। আবার শশী কিন্তু বেনুর উপর রেগে গেছে কারণ বেনু আমার সঙ্গে তর্ক করেছে;
- রোহন কম্পিউটারকে LCDর সঙ্গে লাগিয়েছে, আমি সহজেই ক্লাশে তা ব্যবহার করতে পেরেছি।

এই সমস্ত তথ্যগুলিকেই কিন্তু মানে প্রকাহ করে জানাতে হবে। পাঁচ পয়েন্ট গ্রেডে ৫ হল সর্ব্বোচ্চ গ্রেড এবং ১ বা তার কম হল কোন গুন পরিমাপের ক্ষেত্রে সর্ব নিম্ন গ্রেড বা অকৃতকার্যতা। উপরের উদাহরণে বেনুকে '৫' দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু শশীকে ২ বা ১ দিতে হবে।

ii) প্রত্যেক পর্যায়ে রেটিং করা :

রেটিং দু-ভাবে করা যেতে পারে। একটি হল পয়েন্ট এ দেওয়া— এই পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্ট স্কেলে হতে পারে— যেমন ৫ (সব থেকে ভাল), ৪ (খুব ভাল), ৩ (ভাল), ২ (ভাল নয়), ১ (খুব খারাপ)।

এই ভাবে সমস্ত দক্ষতার পরিমাপের পরে ঐ নম্বরকে পাঁচের মধ্যে হিসাব করে গ্রেড পয়েন্টে পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন নিম্নলিখিত ভাবে করা হয় :

গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
A	4·1 – 5·0
B	3·1 – 4·0
C	2·1 – 3·0
D	1·1 – 2·0
E	0 – 1·0

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট করা যাক। ধরা যাক জীবনশৈলীর সমস্ত দক্ষতাগুলির মোট নম্বর ৩০০। এতে উর্বষী ২২৫ নম্বর পেয়েছে। তাহলে ৫-এর মধ্যে কত হয়? ৫-এ উর্বষীর মান হবে $\frac{\text{ততত}}{\text{ততত}}$ ত তত্তত এই ৩·৭৫ মান 'B' গ্রেডের মধ্যে পড়ে। কারণ 'B' গ্রেডের মান 3·1 – 4·01 কাজেই জীবনশৈলীতে উর্বষী 'B' গ্রেড পেয়েছে।

আমরা এক্ষেত্রে আর একট উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব। সহ-বিষয় ভিত্তিক কার্যাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ

বিভাগ হল 'সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী' (Co-Curricular Activities)। এই সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে হতে পারে—

i) সাহিত্য এবং সৃজনশীল দক্ষতা

ii) বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান ভিত্তিক দক্ষতা

iii) তথ্য এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত বিষয়

iv) সংগঠন এবং নেতৃত্বদানের দক্ষতা ইত্যাদি

ধরা যাক এইগুলির চতুর্থটি অর্থাৎ 'সংগঠন এবং নেতৃত্বদানের দক্ষতার' মূল্যায়ণ করা হবে। বিদ্যালয়ে যদি ক্লাব থাকে অথবা শিক্ষার্থী যদি কোন ক্লাবে যুক্ত থাকে বা তার নিজের পাড়ায় কি কি কাজে যুক্ত থাকে তা পর্যবেক্ষণ করে গ্রেডিং করা হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সূচকগুলি পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে—

* সংগঠন এবং নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা :

ক্রমিক সংখ্যা	সূচক	মান				
		১	২	৩	৪	৫
১.	অনুষ্ঠান সংগঠিত করে এবং অনুষ্ঠানে সাহায্য করে					
২.	দলে কাজ করার দক্ষতা আছে—					
৩.	খুব অল্প সময়ে দলগঠন করতে পারে—					
৪.	সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন সংগঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন বিদ্যালয়ের পরিবেশ ক্লাব, স্বাস্থ্য ক্লাব ইত্যাদিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে।					
৫.	কোন অনুষ্ঠানে নিজের শ্রেণীকে, নিজের স্কুলকে, নিজের পাড়াকে বা জেলার প্রতিনিধি হিসাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে—					

iii) বাৎসরিক পরীক্ষা :

আগের যে সমস্ত মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে সে গুলোতে এক একটি দক্ষতার মূল্যায়ণ করা হয়। কিন্তু সমস্ত দক্ষতার একত্রে মূল্যায়ণের জন্য অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিক পরীক্ষার প্রয়োগ করা হয়। এরজন্য আদর্শায়িত প্রশ্নপত্র বা টেষ্ট ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রেও গ্রেড পয়েন্ট বা নম্বর প্রদান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এরপরে অন্যান্য মূল্যায়ণ প্রাপ্ত গ্রেডের সঙ্গে বাৎসরিক বা অর্থবাৎসরিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেডকে যুক্ত করা হয়ে থাকে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-৩ (Check your progress-3)

নির্দেশ : ক) .....

খ) .... পূর্বের মত

i) জীবন শৈলী কাকে বলে?

---

ii) রোহন পাঁচ পয়েন্ট গ্রেডে ৩·৭৫ পয়েন্ট পেয়েছে। রোহনের গ্রেড কত?

৩.৫ প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন একটি কৌশল। এই কৌশল শিক্ষক ব্যবহার করেন শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন করার জন্য। এই ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোন রকম বাইরের চাপ থাকবেনা বরঞ্চ শিক্ষার্থীর পক্ষে সহায়ক পরিবেশ থাকবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ধারাবাহিক সাহায্য করবেন এবং শিক্ষার্থীও তার শিখনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ঘটবে শ্রেণী কক্ষের ভিতরে এবং বাইরে। শ্রেণী কক্ষে যখন শিক্ষক শিক্ষাদান করেন তখন সমস্ত পাঠ্য অংশকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে নেন এবং শ্রেণী কক্ষে কিভাবে কতটুকু পাঠদান করবেন তাও ঠিক করে নেন। প্রত্যেকটি পাঠদানের পর শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, কেন কোন কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, কিভাবে ঐ ত্রুটি দূর করা যাবে তা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ঠিক করেন। এই অংশগুলি প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ণের মধ্যে পরে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ মূল্যায়নের কৌশল হিসাবে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নকে বিভিন্ন গুরুত্ব দিয়েছেন। কয়েকটি নীচে দেওয়া হল :

- ব্লাক এবং উইলিয়ামের মতে (১৯৯৯), "… Often means no more than the assessment is carried out frequently and is planned at the same time as teaching."
- হারালন (১৯৯৮) বলেছেন, "… provides feedback which leads to students recognising the (learning) gap and closing it. …it is forward working …"
- টানস্টল এবং গিপ্‌সের মতে (১৯৯৬), "…is used essentitially to get a feed back in to the teaching and learning process."

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য :

- এই প্রকার মূল্যায়ন কারণ খুঁজে বার করে এবং সমাধানের পথ দেখায়;
- সঠিক ফিডব্যাকের ব্যবস্থা করে;
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের শিখনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে সাহায্য করে;
- মূল্যায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষা পরিকল্পনা করতে পারে;
- শিক্ষার্থী তার নিজের শিখনের অগ্রগতি বুঝতে পারে এবং তা কিভাবে অগ্রগতি ঘটান যাবে তা বুঝতে পারবে।
- যা শিখবে তা পূর্বের জ্ঞান এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয়।
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং সহপাঠীদের সাহায্য করে।

এই প্রকার মূল্যায়নের জন্য কতগুলি সূচক ব্যবহার করা হয়। এই সূচকের মধ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের কথা ভাবা হয়েছে। এই সূচকগুলি শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সূচকগুলি জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫, শিক্ষর অধিকার আইন ২০০৯ এবং নির্মিতিবাদের ভাবনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই পাঁচটি সূচক হল :

- অংশগ্রহণ (Participation)
- প্রশ্ন ও অনুসন্ধান (Questioning and Experimentation)
- ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য (Interpretation and Application)
- সমানুভূতি ও সহযোগিতা (Empathyand Cooperation)
- নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ (Aesthetic and Creative Expression)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য উপরিউক্ত পাঁচটি সূচক ব্যবহার করেছে। ঐ সূচকগুলি 4 পয়েন্টের পরিমাপের জন্য বলা হয়েছে। নীচে প্রত্যেকটি সূচক এবং তাদের পরিমাপের পদ্ধতি দেওয়া হল :

সূচক -১

* অংশগ্রহণ *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে				
২.	নেতৃত্বদানের গুণাবলী আছে—				
৩.	আদান প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করছে				
৪.	আদান প্রদান করছে কিছু অংশ গ্রহণ খুব বেশী নয়—				
৫.	অংশ গ্রহণে উৎসাহী নয়—				

সূচক -২

* প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	শিখন সহায়ক প্রশ্ন করতে সক্ষম ও অনুসন্ধানে আগ্রহী				
২.	শিখন সহায়ক প্রশ্ন করতে সক্ষম কিন্তু অনুসন্ধানে আগ্রহী নয়				
৩.	শিখন সহায়ক প্রশ্ন করে না কিন্তু অনুসন্ধানে আগ্রহী—				
৪.	প্রশ্ন করে কিন্তু তা শিখন বা শিখন সম্পর্কিত অনুসন্ধানে সহায়ক নয়—				

সূচক -৩

* ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সামর্থ্য *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	ধারণার উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সমর্থ—				
২.	ধারণার উদাহারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ কিন্তু প্রয়োগে অক্ষম				
৩.	আংশিক ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কিন্তু প্রয়োগে অক্ষম—				
৪.	সংশ্লিষ্ট ধারণা কেবলমাত্র মুখস্থ করেছে—				

সূচক -৪

* সমানুভূতি ও সহযোগিতা *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের জন্যই সমান অনুভূতিশীল				
২.	পরিচিতের জন্য সক্রিয়ভাবে সমানুভূতিশীল কিন্তু অপরিচিতের জন্য শুধুই সহানুভূতিশীল—				
৩.	পরিচিতের জন্য সমানুভূতিশীল—				
৪.	পরিচিত বা অপরিচিত কারুর জন্যই সমানুভূতিশীল নয়				

সূচক -৫

* নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ *

ক্রমিক সংখ্যা	সূচকের বিভাগ	মান			
		১	২	৩	৪
১.	নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল (শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে)—				
২.	নান্দনিক ও সৃষ্টিশল (শ্রেণীকক্ষের ভিতরে)—				
৩.	নান্দনিক সৃষ্টিশীল কর্মকারেড আগ্রহী—				
৪.	নান্দনিক কিন্তু সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে আগ্রহী নয়—				

একটি উদাহরণের সাহায্যে কিভাবে নম্বর প্রদান বা গ্রেডিং হবে তা আলোচনা করা যাক। ধরাযাক উপরের পাঁচটি সূচকে ২৫ × ৫ = ১২৫ নম্বর আছে। রেবেকার মোট নম্বর ১০৮; শতকরা হিসাবে এর মান ৮৬·৪% এক্ষেত্রে গ্রেডিং-এর হিসাব :

A = 75 – 100%
B = 50 – 74%
C = 25 – 49%
D = 25% এর কম

রেবেকার স্কোর ৮৬·৪% অর্থাৎ সে 'A' গ্রেড পেয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হবে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে। অর্থাৎ প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরের জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। প্রদত্তসূচক ও নির্দেশিকাগুলিকে সফল করার জন্য যে সমস্ত কৌশল কাজে লাগানো যেতে পারে তা হল— ১. কুইজ ২. বিতর্ক ৩. প্রকল্প ৪. তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ৫. দলগত আলোচনা ৬. এক্সপেরিমেন্টস্ ৭. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ৮. প্রকৃতি পাঠ ও বনসৃজন ৯. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ১০. দেয়াল পত্রিকা ১১. সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী ১২. বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৩.৬ পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

শিক্ষক পাঠদানকালে দু'ধরনের মূল্যায়ন করেন। পাঠদান চলাকালীন এবং পাঠদান শেষে। পাঠদান শেষে শিখনের উদ্দেশ্যগুলি কতটা অর্জিত হয়েছে জানার জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকেই পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন বলে। এই মূল্যায়ন মাষিক, যান্মাষিক বা বাৎসরিক হতে পারে। এবারে দেখা যাক এই প্রকার মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের ধারণা কি।

- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অ্যাঞ্জিলো এবং ক্রশ (১৯৯৩), এর মতে, "Good summative assessments—tests and other graded evaluations must be demonstrably reliable, valid and free of bias."

- অঅবার ব্লাক এবং উইলিয়ম বলেছেন (১৯৯৯), "…assessment (that) has increasingly been used to sum up learning."
- হারলেন (১৯৯৮) বলেছেন, "…looks of past achievements…adds procedures or tests to existing work…involves only making and feedback grades to students…is seperated from teaching…is carried out at intervals when achievement has to be summarised and reported."

এই প্রকার মূল্যায়নের জন্য লিখিত বা পাঠ শেষ পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার জন্য নৈর্ব্যাক্তিক, ছোট উত্তর এবং বড় উত্তর ব্যবহার করা হবে। তবে প্রশ্ন করার সময় শিক্ষককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রশ্ন যেন পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রীক মুখস্ত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র না হয়ে ওঠে। এই প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা এবং সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাবে এবং এতে শিক্ষার্থী যা শিখবে তারই প্রয়োগ ঘটাবে।

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য :

এই প্রকার মূল্যায়ন দু'ভাবে হতে পারে : বর্হিমূল্যায়ন এবং অন্তমূল্যায়ন। এই দুই প্রকারেরই কিছু বৈশিষ্ট আছে। এই প্রকার মূল্যায়নে কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। এই মূল্যায়নের ফলাফলকে সকল সময় সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বর্তমান নাও থাকতে পারে। পরীক্ষার উপর বেশী জোড় দিলে বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞান এবং দক্ষতার উপর জোড় দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীর মনে ক্রমে এই ধারণা জন্মাতে পারে যে শেখা এবং পরীক্ষার ভাল ফল করা এক নয়। এর ফলে যে ত্রুটি শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে তা হল 'learn and forget'। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগীতার মনোভাব গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে চাপ এবং উদ্বেগ তৈরী হয়। যাই হোক এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হল :

- শিখনের পরিমাপ হয়;
- বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেয়;
- সাধারণতঃ কোন এককের শেষে বা বছরের শেষে অনুষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষার্থীর মোট শিখনের পরিমাপ করে;
- স্থানীয় প্রভাবের (বিদ্যালয় ইত্যাদি) গুরুত্ব আছে?
- সব থেকে পুরাণ কৌশল;
- যথার্থতা এবং নির্ভর যোগ্যতা সবসময় থাকে না।

৩.৭ সার সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা বিষয় ভিত্তিক এবং সহ বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের এবং সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের।

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের মধ্যে কি কি বিষয় থাকবে এবং টুল এবং কৌশল কি হবে তারও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। টুলগুলির মধ্যে থাকবে প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ, বিতর্কসভা, পরীক্ষা এবং ইনভেনটরি, চেকলিষ্ট, রেটিং স্কেল, অ্যানেকডোটাল রেকর্ড, তথ্যপঞ্জী ইত্যাদি।

এরপরে আলোচনা করা হয়েছে সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ণের। এই সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের বিভিন্ন বিভাগগুলির ও আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল জীবনশৈলী।

এরপরের অংশে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন। এরমধ্যে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শেষ অংশে পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন এবং এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৩.৮ অনুশীলনী

ক) খুব সংক্ষেপে উত্তর দিন :

(i) বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন কে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ii) লিখিত পরীক্ষা কত ভাগে ভাগ করা যায়? কি কি?

(iii) বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কি কি হতে পারে?

(iv) পর্যবেক্ষণের দুইটি সীমাবদ্ধতা লিখুন।

খ) সংক্ষেপে উত্তর দিন :

(i) বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের টুল কি কি হতে পারে?

(ii) পর্যবেক্ষণের সুবিধা কি?

(iii) বিতর্ক সভা পরিমাপের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করুণ।

গ) রচনা ধর্মী প্রশ্ন

(i) অ্যানেকডোটাল রেকর্ড উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দিন।

(ii) তথ্যপঞ্জীর বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা কর।

(iii) সহ-বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি কি কি?

৩.৯ আপনার উত্তর যাচাই করে নিন এর উত্তর—

১। এর উত্তর—

(i) শিক্ষন-শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো এবং মূল্যায়ন প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায় ক্রমিক।

(ii) পরীক্ষা এবং প্রকল্প

২। এর উত্তর—

(i) পাঠ্যবিষয় ছাড়াও আরো যা যা দরকার

(ii) ব্যক্তিগত সচেতনতা এবং সমস্যা সমাধান

৩। এর উত্তর—

(i) জীবনশৈলী হল দক্ষতা যা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সহবস্থান করতে শেখায় এবং প্রতিকুল অবস্থার থেকে আচরণ পরিবর্তন ঘটাতে শেখায়।

(ii) B

একক ৪ ❑ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের টুল এবং কৌশল (Tools and Techniques of CCE in Pre-primary Education)

গঠন **(Structure)**

৪.১ সূচনা **(Introduction)**

৪.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৪.৩ পরিমাপের পদ্ধতি **(Methods of Assessment)**

৪.৪ পরিমাপের টুল **(Tools of Assessment)**

৪.৫ পরিমাপের কৌশল **(Techniques of Assessment)**

৪.৭ সারসংক্ষেপ

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৯ অগ্রগতি যাচাই এর উত্তর

৪.১ সূচনা (Introduction)

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন বিষয়ভিত্তিক, প্রস্তুতিকালীন, পর্যায়ক্রমিক ইত্যাদি মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের টুল (Tools) এবং কৌশল (Techniques) নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আপনার এই অধ্যায়ে জানতে পারবেন নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের পদ্ধতিগুলি কি কি, এই পরিমাপের জন্য কি কি টুল ব্যবহার করা হয় এবং সবশেষে এই টুল ব্যবহার করে পরিমাপ করার পর এর ফলাফল কি ভাবে পরিমাপ করা হয়।

এক কথায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিশুর সমস্ত দিকের বিকাশ এবং বৃদ্ধির পরিমাণগত এবং গুণগত পরিবর্তন জানা যায় এবং এর সাহায্যে শিশুকে কিভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কতটা এবং কি ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে তাও জানা যায়। ফলে শিক্ষক/শিক্ষিকা পিতা-মাতা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয়কেও এই বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরুরী। কোন কৌশল কোন টুলের ব্যবহার হবে। মূল্যায়ন কিভাবে করা হবে ফলাফল কিভাবে প্রকাশিত হবে এ সমস্ত না জানলে একদিকে যেমন মূল্যায়ণের সমস্ত উদ্‌যোগই ব্যর্থ হয় অন্যদিকে সঠিক পরিমাপ না হলে শিশু/শিক্ষার্থীর পক্ষেও তা মঙ্গলজনক নয়।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি শেষ করার পরে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে, বুঝতে, শিখতে এবং ব্যবহার করতে পারবে :

- নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণে বিভিন্ন পদ্ধতি ;
- পরিমাপের বিভিন্ন টুল এবং তাদের বর্ণনা ;
- ঐ টুলগুলি দ্বারা পরিমাপের বিভিন্ন কৌশল ;

৪.৩ পরিমাপের পদ্ধতি (Methods of Assessment)

পাঠক্রমের মধ্যে থাকে শিখন-শিক্ষণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। অর্থাৎ পাঠ্যতালিকা, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, পরিমাপের পদ্ধতি ইত্যাদি সমস্ত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পাঠক্রমের মধ্যে থাকবে একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদির একটি পূর্ণ তালিকা। এই পরিমাপ বা মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিক্ষণে অগ্রগতি এবং শিক্ষার্থীর উন্নতিই পরিমাপ করে না এর দ্বারা শিক্ষকের দক্ষতা এবং শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা এবং সাফল্যও পরিমাপ করেন। কাজেই একে পাঠক্রমের একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমরা পরিমাপকে নানা কারণে ব্যবহার করি :

(ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং দুর্বলতা অনুসারে তার ব্যক্তিগত এবং বিশেষ চাহিদার নির্ণয় করতে পারি;

(খ) শিক্ষক-শিখন পদ্ধতির পরিকল্পনা আরো সুন্দর, আরো ভালভাবে তৈরী করা;

(গ) বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দিয়ে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে আরো উন্নত করা;

(ঘ) বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে কতটা পরিবর্তন এবং উন্নতি ঘটেছে তার প্রকৃতি এবং পরিমাপ নির্ধারণ করা;

(ঙ) শিশুকে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল এবং বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন তা তাকে বুঝতে বা জানতে সাহায্য করা;

(চ) শিশু কি কি পছন্দ করে, কোন কোন দিকগুলি পছন্দ করে না তা শিক্ষককে বুঝতে সাহায্য করে;

(ছ) শিশুর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;

(জ) পাঠক্রমের লক্ষ এবং পাঠ্যতালিকার উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা জানা যায়;

(ঝ) শিশুর শিখনে উন্নতি কতটা হয়ে তা শিশুকে, শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয়কে এবং শিক্ষকদের জানানো যায়;

(ঞ) শিশুকে সাহায্য এবং উৎসাহিত করা যাতে তারা নিজের বুঝতে এবং তাদের প্রয়োজন বুঝতে পারবে;

(ট) প্রত্যেক শিশুর শিখন এবং উন্নতিতে সাহায্য করা এবং পিতা-মাতা অন্যান্য শিক্ষকদের একই কাজে যুক্ত করতে পারবে।

পরিমাপের পদ্ধতি বৃত্তাকার; অর্থাৎ পরিমাপের প্রাপ্ত ফলাফল ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হয় আরো উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য। এর বিভিন্ন ধাপগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য এবং প্রমাণ সংগ্রহ করা;

(২) প্রাপ্ত তথ্যকে পঞ্জীভূত করা; এবং

(৩) পঞ্জীকৃত তথ্যকে ব্যবহার করা।

আমরা যদি মনে করি শিশু শিখন নানাভাবে হয়— বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে; তবে আমরা তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করব। কারণ বিদ্যালয়ের ভিতরে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বিদ্যালয়ের বাইরের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মত অবশ্যই না হতেও পারে। কাজেই প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার তথ্যের উৎসগুলি কি কি হতে পারে।

তথ্যের উৎস ঃ প্রথম ধাপ

আমরা জানি যে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষকই শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করেন। আবার পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর শিখনের পরিমাপ এবং অগ্রগতি জানা এবং বোঝা যায়। পরিমাপ যেহেতু শিশুর জন্যই তাই পরিমাপের ক্ষেত্রে শিশুও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কাজেই এক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুর চাহিদা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কতটা পূরণ হয়েছে, কিভাবে পূরণ সম্ভব ইত্যাদি বিষয়গুলিও জানার জন্য সচেষ্ট হবেন। এটা কিভাবে সম্ভব? এক্ষেত্রে শিক্ষক যদি শিশুর কাছে জানতে চান তার কি ভাল লাগে, তার সবথেকে ভাল কাজ কোনটি? এইটিকে কেন সবথেকে ভাল মনে করে তবে তাব উত্তরের মাধ্যমে শিশুর শিখন এবং বিকাশের নানা দিক জানা সম্ভব।

শিশু ছাড়া এই ক্ষেত্রে আর কি কি হতে পারে? এক্ষেত্রে তথ্যের আর যে সমস্ত উৎস হতে পারে তা হল ঃ

● পিতা-মাতা ● শিশুর বন্ধু, সহপাঠী ইত্যাদি ● অন্যান্য শিক্ষক ● তার সমাজের অন্য লোকজন ইত্যাদি। এইবার আমরা মূল বিষয়ে ফিরে আসব— মূল্যায়নের পদ্ধতি। পরিমাপের জন্য চারটি মূল্য পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে :

(ক) একক পরিমাপ পদ্ধতি— এই পদ্ধতিতে শিশুরা যখন একক ভাবে কাজ করে, কিছু শেখে তখন তার পরিমাপ করা হয়।

(খ) দলবদ্ধ পরিমাপ পদ্ধতি— এই পদ্ধতিতে শিশুরা যখন একত্রে নিবদ্ধভাবে কাজ করে তখন তাদের বৃদ্ধি বিকাশ এবং শিখনের বিভিন্ন দিকের পরিমাপ করা হয়। এই পরিমাপের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক বিকাশ, মূল্যবোধ, আচরণের বিভিন্ন দিকের পরিমাপ করা যায়।

(গ) নিজের পরিমাপ (Self assessment)— এই পদ্ধতিতে শিশু নিজের জ্ঞান, দক্ষতা, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির পরিমাপ নিজেই করবে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন টুল ব্যবহার করা হবে।

(ঘ) সহপাঠীদের দ্বারা পরিমাপ (Peer assessment)— এই পদ্ধতিতে একজন অপর জনের অথবা একজন একটি গোটা দলের বিভিন্ন শিশুর পরিমাপ করবে। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু বিভিন্ন টুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ সমস্ত বিদ্যালয়েই পরিমাপের জন্য মধ্যমণি হিসাবে শিক্ষকই সব কাজ করে থাকেন। এক্ষেত্রে যে

পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা শিক্ষক নিজেই প্রস্তুত করে থাকেন। শিক্ষক যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করেন তা হল লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, হাতে কলমে পরীক্ষা, ছবি আঁকা বা অন্য কোন হাতে কাজ করা, অন্যদের সঙ্গে কথা বার্তা বলা, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। দ্রুত পরিমাপের জন্য শিক্ষক অনেক সময়ই ছোট ক্লাশ পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এগুলি সাধারণতঃ একটি অধ্যায়ের পরে অথবা সপ্তাহের শেষে অথবা মাসে মাসে নেওয়া হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমন হওয়া উচিত যাতে শিশু মুখস্থ করা উত্তর না দিয়ে বরং তাদের নিজস্ব ক্ষমতা, ধারণা, চিন্তন, সৃজনশীলতার প্রকাশ উত্তরের মধ্যে ঘটাতে পারবে। অর্থাৎ এর প্রশ্নগুলোতে শুধুমাত্র মনে রাখা, মুখস্ত করা ইত্যাদির বৃদ্ধি না ঘটিয়ে বরঞ্চ শিশুর চিন্তন, বিশ্লেষণ ইত্যাদিরও বিকাশ ঘটানো হবে। অর্থাৎ প্রশ্নগুলোর দ্বারা যেন শিশুর বিভিন্ন গুণের পরিমাপও করা যায়।

এর জন্য অবশ্য বিদ্যালয়ের লিখিত পরীক্ষাই সবথেকে বেশী ব্যবহার হয়; তবে অনেক বিদ্যালয়ে নানা ধরনের টুল ব্যবহার করা হয়; কিন্তু অনেক সময়ই শিক্ষক তা না বুঝেই ব্যবহার করেন। ফলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবের থেকে পার্থক্য হয়ে যায়।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার— কোন একটি টুল শিশুর সবদিকের বিকাশ এবং বৃদ্ধির পরিমাপ করতে পারেনা। শিক্ষক যখন স্বিয় কাজ পরিচালনা করেন তখন নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন, শিশুকে দূর থেকে লক্ষ করা, তাদের কথা শোনা, তাদের বন্ধুদের শিশুটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, শিশুর মা-বাবার সাথে কথা বলা ইত্যাদির মাধ্যমেও শিশুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায় যা শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় না। লিখিত পরীক্ষার দ্বারা শুধুমাত্র কয়েকটি দিক জানা সম্ভব; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিশুর সমস্ত দিকের বিকাশ জানাতে চাই যাতে—

(i) বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দিক এবং বিকাশের সমস্ত দিকের বিকাশ এবং শিখন মাত্রা জানা যায়;
(ii) শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে যাতে বোঝা যাবে সে কোন পদ্ধতি, কোন বিষয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে;
(iii) প্রত্যেক পদ্ধতি আলাদা; তাই বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখনের দিকগুলিও ভিন্ন। শিক্ষক এই সমস্ত দেখেই ঠিক করবেন শিশুর শিখন কোন দিকে এবং কি ভাবে ঘটছে।

কাজেই তথ্যের উৎস কি হতে পারে তা মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐ উৎস অনুসারে ঠিক হবে শিক্ষণ পদ্ধতি, পরিমাপ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলিও।

প্রাপ্ত তথ্যকে পঞ্জীভূত করা ঃ দ্বিতীয় ধাপ

প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শিশু সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যকে পঞ্জীভূত করা হয়— নম্বরের মাধ্যমে বা গ্রেড প্রদানের মাধ্যমে। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে সরাসরি বা তাকে গ্রেডে রূপান্তরিত করে পঞ্জীভূত করে রাখা হয়। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল এই পঞ্জীভূত করার এমন পদ্ধতি ঠিক করা যে পদ্ধতিতে এই কাজটি সব থেকে ভালভাবে হয়। এই সবথেকে ভাল পদ্ধতি হল নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণ (CCE)। এই পঞ্জীভূত করণকে আরো সঠিক এবং বাস্তব করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা হ'ল ঃ

- শিশুকে খুব ভাল ভাবে নজর রাখতে হবে। এই নজর রাখার পরে সঙ্গে সঙ্গে তা কোন ডাইরী, নোটবই বা রেজিস্টারে যা দেখা গেছে তা লিপিবদ্ধ করা;
- শিশুর যখন কোন কাজ করছে বা সদ্য করা হয়েছে তখনই পরিমাপ করার ব্যবস্থা করা;
- এই তথ্যকে পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করতে হবে। এর মধ্যে যে সমস্ত নতুন এবং অর্থপূর্ণ ঘটনাও বিশেষভাবে নথিভুক্ত করতে হবে।

- শিশুর একটি তথ্যপঞ্জী এইভাবে তৈরী করতে হবে।
- শিশুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে যে শিশুর কাজ কিভাবে হয়েছে, কেন এভাবে করার কথা ভেবেছে ইত্যাদি।
- এই তথ্য লিপিবদ্ধ করার সময় শিক্ষক সতর্কভাবে শিশুর পরিবর্তন, বিভিন্ন সমস্যা, কাজের ধরণ এবং শিখনের প্রমাণ ইত্যাদির প্রতি নজর রাখবেন।
- এই তথ্য লিপিবদ্ধ করার সময় শিশুর সম্বন্ধে কোন অস্বচ্ছ ধারণা থাকলে তাও পরিষ্কার হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ কাজ চলাকালীন শিক্ষক কিছুই নজর করেন; কিন্তু তা লিপিবদ্ধ না করার জন্য বেশীর ভাগ সময় তা ভুলে যান এবং মূল্যায়ণের সময় তা কাজে আসে না। কিন্তু অনেকে আবার পরিকল্পিতভাবে ঐগুলি নিজের ডাইরীতে টুকে রাখেন এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করেন। তবে ঐক্ষেত্রে মূল্যায়ন কিন্তু প্রথাগত এবং পরিকল্পিত।

পঞ্জীভূত তথ্যকে ব্যবহার করা— তৃতীয় ধাপ

তথ্য সংগ্রহ এবং তা লিপিবদ্ধ করাই মূল্যায়ণের শেষ কাজ নয়। এই তথ্য সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করাও দরকার। কারণ ঐ পরিমাপক পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি থাকলে তা শিশুর ক্ষেত্রে ভালোর থেকে খারাপ প্রভাবই বেশী হবার সম্ভাবনা থাকবে। তাই পঞ্জীভূত তথ্যকে কিভাবে ব্যবহার হবে। শিশুর শিখন কি পর্যায়ে রয়েছে এবং তার কিভাবে সাহায্যের দরকার তা জানার জন্যই এই তথ্য ব্যবহার করা দরকার।

এর সাহায্যে শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি কতটা ঠিক, শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থাপনা ঠিক মত চলছে কিনা, শিক্ষা বিজ্ঞানের সমস্ত ব্যবহার ঠিক মত হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি ঠিক মত হচ্ছে কিনা তা জানতে পারবে।

আগেই বলা হয়েছে শিশুর পরিমাপের জন্য পাঁচটি সূচকের ব্যবহার করা যেতে পারে। ঐ সূচকগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নানা ভাবে মূল্যায়ন এবং পরিমাপে সাহায্য করে থাকে। সূচকগুলি তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করতে পারে ঃ

- শিশুর শিখন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কতটা এবং কিভাবে তা ধারাবাহিকভাবে বুঝতে পারা যায়;
- সহজভাবে প্রত্যেক শিশুর শিখনের একটি নির্দিষ্ট মাপ কাঠি শিশুকে তাদের পিতামাতাকে এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট জায়গায় জানানো যায়;
- শিশুর শিখনকে নির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করা; শিখনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তা পঞ্জীভূত করতে সাহায্য করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-১ (Check your progress-1)

নির্দেশ : ক) একই নির্দেশ হবে।

খ)

i) পরিমাপের দুটি পদ্ধতি লিখুন

---

ii) তথ্যের উৎসের একটি ধাপ লিখুন

৪.৪ পরিমাপের টুল (Tools of Assessment)

অনেক সময়ই টুল এবং কৌশল (techniques) কে আলাদাভাবে সংজ্ঞা দেওয়া একটু অসুবিধাজনক। তবে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। যে সমস্ত টুল নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের জন্য ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হ'ল ঃ

(ক) প্রশ্নপত্র, (খ) পর্যবেক্ষণ, (গ) অভীক্ষা (টেস্ট) এবং ইনভেন্টরী, (ঘ) চেকলিষ্ট, (ঙ) রেটিং স্কেল, (চ) অ্যানেকডটাল রেকর্ড, (ছ) তথ্যপঞ্জী (Portfolio), (জ) তথ্য বিশ্লেষণ (Document Analysis)

এবারে আমরা কয়েকটি উপকরণ (tool) সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

(ক) প্রশ্নপত্র (Questions) :

প্রশ্নপত্র দুধরনের হতে পারে— আদর্শায়িত এবং আদর্শায়িত নয়।

প্রশ্নপত্র যদি আদর্শায়িত হয় তবে তাদ্দর কতগুলি মৌলিক গুণাবলী থাকবে, যেমন যথার্থ্যতা (Validity), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), নৈর্ব্যাক্তিকতা (Objectivity), প্রয়োগক্ষমতা (Applicability) ইত্যাদি। একটি ভাল প্রশ্নপত্রের কতগুলি গুণ থাকতে হবে। এই গুণগুলি হল ঃ নৈর্ব্যাক্তিকতা, নির্দেশপাদানের পদ্ধতি, প্রয়োগের পরিধি, বিষয়বস্তু, ভাষার ব্যবহার, কাঠিন্যের মান, পরিমাপের ক্ষমতা, পরিমাপর পদ্ধতি ইত্যাদি।

প্রশ্নপত্রের আকার ঃ বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে প্রশ্নপত্র নানা রকম হতে পারে। তবে বিভিন্ন গুণাবলী পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রয়োজন হতে পারে। একটি ভাল প্রশ্নপতরের নিম্নলিখিত ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে ঃ

(i) মনে রাখা (Remembering), (ii) বোঝা (Understanding), (iii) প্রয়োগ উপযোগী (Applying) ; (iv) বিশ্লেষণধর্মী (Analysing), (v) মূল্যায়ণ করান (Evaluating), (vi) সৃজনশীল (Creating) ইত্যাদি।

প্রশ্নপত্রের প্রকার ঃ প্রশ্নপত্রের উত্তর অনুসারে প্রশ্নপত্রকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ (i) রচনাধর্মী প্রশ্ন, (ii) ছোট উত্তর, (iii) খুব ছোট উত্তর, (iv) নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্ন। এই প্রত্যেক ধরনের আবার নানা বৈশিষ্ট্য আছে।

(খ) পর্যবেক্ষণ (Observation) :

শিশুর সম্বন্ধে তথ্য যে সমস্ত ভাবে পাওয়া যেতে পারে তার মধ্যে পর্যবেক্ষণ অন্যতম। এই পর্যবেক্ষণ 'স্বাভাবিক' অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করেও পাওয়া যেতে পারে। এই কাজ শিশু যখন কোন কাজের মধ্যে থাকে তখন সংগ্রহ করা হয়। এই কাজ করার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট নিয়মে করা হয়।

পর্যবেক্ষণের সুবিধা— পর্যবেক্ষণের নানা রকম সুবিধা আছে। কয়েকটি নীচে দেওয়া হল ঃ

- শিশুর ব্যক্তি সত্তার বিভিন্ন দিক দেখা, চেনা এবং তার পরিচয় পাওয়া যায়;
- শিশুকে ব্যক্তি হিসাবে এবং দলবদ্ধ অবস্থায় তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়;
- বিভিন্ন সময়ের অবকাশে শিশুর বিভিন্ন দিকের পরিমাপ করা যায়;
- দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি কিভাবে গঠিত হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে তা জানা যায়।

পরিমাপের টুল হিসাবে পর্যবেক্ষণের অসুবিধা— এই প্রকার কৌশলের কতগুলি অসুবিধা আছে, যেমন ঃ

- দু একটি পর্যবেক্ষণের দ্বারাই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালে অনেক সময়ই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না হতেও পারে।
- পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি 'কি' এবং 'কিভাবে' পর্যবেক্ষণ করবেন তা নাও জানতে পারেন।
- পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণের নৈর্ব্যাক্তিকতত্রা থাকা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণের সময় মানসিক অবস্থাও পর্যবেক্ষণের উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে।
- একটি বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানের পর্যবেক্ষণ একই শিশুর উপর স্থান-কাল-পরিবেশের অনুসারে পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ই পর্যবেক্ষক একই সিদ্ধান্ত অন্যসময়ও ব্যবহার করেন।

পর্যবেক্ষণ নানাভাবে শিশুর প্রকৃতি, আচার-আচারণ, শিখনের অগ্রগতি ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারে। বিভিন্ন কৌশলের পরিমাপের জন্য পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন বিতর্ক, দলবদ্ধ কাজ, হাতেকলমে কাজ, প্রোজেক্টের কাজ, খেলাধূলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিমাপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে করা যায়।

(গ) অভীক্ষা (Test) এবং ইনভেন্টরী

অভীক্ষা মৌখিক এবং লিখিত এই দুরকমই হতে পারে। আবার মৌখিক পরীক্ষার পদ্ধতি এবং কৌশল এবং লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি এবং কৌশলও নানা রকম হতে পারে। একটি অন্যটির পরিপূরক। শিশু নিজের বিষয় নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারে কিনা তা মৌকিক পরীক্ষার দ্বারা বুঝতে পারা যায়। আবার নিজের বক্তব্য নিজে লিখিতভাবে জানাতে পারে কিনা তা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়।

মৌখিক পরীক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরীক্ষা এবং এতে সময় লাগে বেশী। তবে লেখার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলে মৌখিক পরীক্ষাই ভাল পদ্ধতি। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর প্রগতির পরিমাপের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষাই ভাল পদ্ধতি।

মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষা এবং ইনভেন্টরীর সুবিধাগুলি নিম্নরূপ ঃ

- শিক্ষার্থীকে পরিমাপ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে;
- শোনা এবং বলার ক্ষমতার পরীক্ষা করা যায়;
- কথা বলার দ্রুততা, সঠিকভাবে ব্যাখ্য করার ক্ষমতা পরিমাপ করতে পারে;
- জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিশুর জানার গভীরতা পরিমাপের সাহায্য করে।

তবে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা থাকা চাই এবং প্রশ্নের ধরন কেমন হবে তার নৈর্ব্যাক্তিকতা, যথার্থতা ও সত্যতা থাকা চাই।

(ঘ) চেক লিষ্ট

একটি বিশেষ গুণ বা দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে এই প্রকার অভীক্ষা (Test) প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রেও কিন্তু পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণের পরে তা বিশেষভাবে তালিকাভুক্ত করা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য কতটা তা পরিমাপ করা হয়।

চেকলিষ্টের সুবিধা ঃ চেকলিস্টের ব্যবহার সুবিধাজনক। কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

- সহজ এবং দ্রুত হয়;
- একটি বিশেষ গুণের তথ্য প্রদান করে;
- একটি শিশু কখন এবং কিভাবে আয়ত্ত করছে তা জানা যায়;
- শিশু দলবদ্ধভাবে ঐ গুণটি ব্যবহার করে কিনা তাও জানা যায়।

সতর্কতা ঃ এই অভীক্ষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ঃ

- এতে একটি বিশেষ গুণের সম্বন্ধে সাধারণ কিছু তথ্য জানা যায়;
- বিভিন্ন অবস্থায় ঐ আচরণ কেমন হতে পারে তা জানা যায় না;
- বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না;
- অভিজ্ঞতা না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে এই অভীক্ষা প্রস্তুত করা সহজ নয় বা সঠিক তথ্যও পাওয়া যায় না।

(ঙ) রেটিং স্কেল

পর্যবেক্ষণ এবং চেকলিস্টের মত রেটিং স্কেলের দ্বারাও শিশুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা যায়। এর দ্বারা শিশুর কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা যায়। এর দ্বারা শিশুর কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিশুর অগ্রগতির কতটা তার পরিমাপ রেটের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

সুবিধা ঃ

- বিভিন্ন ধরনের অগ্রগতি একটি নির্দিষ্ট স্কেলে মাপা হয়;
- একক এবং দলবদ্ধ পরিমাপের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার হয়;
- বিভিন্ন পরিবেশ এবং অবস্থায় পরিমাপ সম্ভব;
- শিশুর অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময় কতটা জানা যায়;
- দীর্ঘ সময় ধরে রেটিং স্কেলের মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিখনের ধরন, অগ্রগতি ইত্যাদি জানা যায়।

ব্যবহারের সতর্কতা ঃ যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তা হল ঃ

- শিক্ষক বা পরিদর্শকের অভিজ্ঞতা থাকা চাই;
- কি কি জানতে হবে তা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে হবে;
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রাপ্ত তথ্য সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না।

(চ) অ্যানেকডটাল রেকর্ড

অতীতের ঘটনা লিপিবদ্ধ করার এটি একটি পদ্ধতি। কোন শিশুর প্রাত্যহিক ঘটনা দিন, তারিখ এবং সময় সহ লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিই হল 'অ্যানেকডটাল রেকর্ড'।

এই তথ্য ভবিষ্যতে কাজে লাগে। শিশুর উন্নতি কি ভাবে হচ্ছে; কোথায় হচ্ছে না, কোথায় তা ধীর হয়েছে তা এর মাধ্যমে জানা যায়।

সুবিধা ঃ

বিভিন্ন ক্ষেত্রের তথ্য একটি ঘটনার মাধ্যমে জানা যায়;

শিশুর সামাজিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি কি এবং কি ভাবে ঘটছে তা জানা যায়;

শিশুর শক্তি বা দুর্বলতা জানা যায়;

দীর্ঘ সময় ধরে শিশুর অগ্রগতি জানা যায়।

ব্যবহারের সতর্কতা ঃ

একটি ঘটনা দিয়ে শিশুর ক্ষমতার পরিমাপ ঠিক নয়;

বিশেষ অবস্থায় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু ঐ তথ্যটি লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা ঠিক নয়;

শিক্ষক যেটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন সেটিই কেবল লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু কোন সাধারণ ঘটনা অন্যের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে।

অ্যানেকডোটাল রেকর্ডের উদাহরণ ঃ		
বিদ্যালয়ের নাম ঃ		
শিক্ষার্থীর নাম ঃ	শ্রেণী ঃ	বয়স ঃ
পরিদর্শক শিক্ষক ঃ	স্থান ঃ	তারিখ ঃ
ঘটনার বর্ণনা ঃ		
পরিদর্শকের মন্তব্য ঃ		

স্বাক্ষর

অ্যানেকডোটাল রেকর্ডের ব্যবহার ঃ

ধারাবাহিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে অ্যানেকডোটাল রেকর্ড খুবই মূল্যবান। কয়েকটি ব্যবহার নীচে দেওয়া হল ঃ

- এর দ্বারা ব্যক্তি সত্তার নির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়;
- বিভিন্ন অবস্থায় শিশুর বিভিন্ন আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়;

- ধারাবাহিক পরিমাপ পাওয়া যায়;
- নিজের মূল্যায়ণ তথ্যের মাধ্যমে নিজেই করতে পারে;
- এই প্রকার তথ্য চিকিৎসার কাজের ব্যবহার করা যায়;
- শিক্ষককে এই তথ্য ব্যবহার করায় উৎসাহ দেয়;
- এর দ্বারা ব্যক্তিসত্তার নির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়;
- বিভিন্ন অবস্থায় শিশুর বিভিন্ন আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়;
- ধারাবাহিক পরিমাপ পাওয়া যায়;
- নিজের মূল্যায়ন তথ্যের মাধ্যমে নিজেই করতে পারে;
- এই প্রকার তথ্য চিকিৎসার কাজের ব্যবহার করা যায়;
- শিক্ষককে এই তথ্য ব্যবহার করায় উৎসাহ দেয়।

(ছ) তথ্য পঞ্জী

সময় ধরে তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন ভাবে তা লিপিবদ্ধ করে রাখার পদ্ধতিই তথ্যপঞ্জীর মাধ্যমে করা হয়। এতে প্রত্যেকদিনের কাজ অথবা বিভিন্ন সময়ের ঘটনা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সুবিধা ঃ এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

- দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষার্থীর একটি দক্ষতায় বৃদ্ধি এবং বিকাশ জানা যায়;
- শিক্ষার্থী তার অগ্রগতি অন্যদের দেখাতে পারে;
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

সীমাবদ্ধতা ঃ

- যে তথ্য ব্যবহার করা হয় তার সঠিক কারণ অনেক সময়েই বোঝা যায় না;
- প্রচুর তথ্য পরিবেশন করলে তা ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা করাও অসুবিধাজনক।

উন্নতকরণের উপায় ঃ

- শিক্ষার্থীকেই উৎসাহ দিতে হবে নিজের তথ্য সংগ্রহের জন্য;
- শিক্ষক অবশ্যই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে যাতে তথ্য সঠিকভাবে লেখা হয়;
- তথ্যকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজন হলে পুরানো তথ্য বাদ দেওয়াও যেতে পারে;
- তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার সময় শিশুর পূর্বের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে;
- তথ্যকে যাতে সহজে ব্যবহার করা যায় তার জন্য তা নম্বর দিয়ে গুরুত্ব অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(জ) তথ্য বিশ্লেষণ (Department Analysis)

এই প্রকার টুল গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। তথ্য পাওয়ার পর তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে এই প্রকার টুল ব্যবহার করা হয়। রচনাধর্মী প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে এই টুল ব্যবহার করা যায়। এখানে শিক্ষক উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করেন, প্রধান প্রধান অংশ কি তা দেখার চেষ্টা করেন এবং সর্বশেষে ঐ অনুসারে নম্বর বা গ্রেড প্রদান করেন।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-২ (Check your progress-2)

নির্দেশ : ক) একই নির্দেশ হবে।

খ)

i) পরিমাপের চারটি টুলের নাম লিখুন

---

ii) চেকলিষ্টের দুইটি ব্যবহার লিখুন

একক ৫ ❑ পরিবেশ (Environment)

গঠন **(Structure)**

৫.১ ভূমিকা **(Introduction)**

৫.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৫.৩ পরিবেশ **(Environment)**

৫.৩.১ পরিবেশের অর্থ **(Meaning of Environment)**

৫.৩.২ পরিবেশের বৈশিষ্ট্য **(Characteristics of Environment)**

৫.৩.৩ পরিবেশের প্রকারভেদ **(Types of Environment)**

৫.৩.৪ পরিবেশের উপাদান **(Components of Environment)**

৫.৪ মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধ **(Relation between man and Environment)**

৫.৫ পরিবেশগত অনুভূতি **(Environmental perception)**

৫.৬ শিশুর পরিবেশ **(Environment of child)**

৫.৬.১ শিশুর ধারণা **(Concept of child)**

৫.৬.২ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ **(Growth and Development of child)**

৫.৬.৩ শিশুর জীবনবিকাশের স্তর **(Development of stages of child)**

৫.৬.৪ শিশুর জীবন বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা **(Role of heridity and environment in the development of child)**

৫.৬.৫ শিশুর জৈবিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা **(Role of environment on biological development of child)**

৫.৬.৬ শিশুর সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা **(Role of environment on social and cultural development of child)**

৫.৭ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

৫.৮ অনুশীলনী **(Exercise)**

৫.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints of answer to check your progress)**

৫.১ ভূমিকা (Introduction)

শিশু ও তার পরিবেশে (Child and his environment)

সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই চায় সুস্থ আর সুন্দর একটা সমাজ। আর এই সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হলে চাই শিশুর মঙ্গল চিন্তা। এ কথা আজ সর্ব জন স্বীকৃত এবং মতবিরোধ হীন। আজকের এই সুস্থ ও সুন্দর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিশুই হল ভবিষ্যতের সুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। অথচ এই শিশুর জীবন অভিজ্ঞতা শুরু হয় অনেক ক্ষেত্রেই অসাম্য ও বঞ্চনার হাত ধরে। এই অসাম্য ও বঞ্চনার প্রথম অভিজ্ঞতা একটি শিশু লাভ করে তার নিজেরই পরিবারে, তার মা-বাবার চোখের সামনেই, তাদের অজ্ঞতার পরিবেশেই। আবার এই মানবশিশুই দ্বিতীয়বার বঞ্চনার স্বীকার হয় তার দ্বিতীয় গৃহ বা বিদ্যালয় পরিবেশে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৃষ্টিভঙ্গি, অজ্ঞতা আর অ-সুখিত্বের জন্য শিশুকে নানা প্রতিকূল ও অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং একটি মানব শিশুর প্রথমে তার নিজ পরিবারে বা গৃহে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে অসাম্য ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় আর এই দুটি স্থানের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যেই ভাবীকালের নাগরিক, এই শিশুটির জীবনে সূত্রপাত ঘটে অসন্তোষ আর অতৃপ্তির জীবন।

এই অসুখী আর অতৃপ্তির যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করে শিশুকে তৃপ্ত ও সুখী মানুষ তৈরি করতে হলে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে তার মা ও বাবাকে এবং তারপর শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। এই কাজ তাদের সম্পন্ন করতে হবে বিজ্ঞান সম্মতভাবে, স্নেহপূর্ণ হাত ধরে যথার্থ সন্তান পালনের মধ্য দিয়ে। এজন্য একদিকে যেমন জানা দরকার শিশুকে তেমনি অন্য দিকে তার পরিবেশকে।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি শেষ করার পরে আপনি—

- পরিবেশের বিভিন্ন দিক জানতে পারবেন।
- পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারবেন।
- শিশুর পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক জানতে ও নির্ণয় করতে পারবেন।

৫.৩ পরিবেশ (Environment)

৫.৩.১ পরিবেশের অর্থ (Meaningof Environment) :

বাংলা 'পরিবেশ' শব্দটি দু'টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত— 'পরি' এবং 'বেশ'। 'পরি' শব্দটি হল সম্যক বা ব্যাপ্তি সূচক একটি উপসর্গ (prefix) এবং 'বেশ' কথাটির অর্থ হল বেষ্টন, বেড় বা ঘিরে থাকা। সুতরাং

'পরিবেশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় পরিবেষ্টন বা আবেষ্টন কিন্তু এই পরিবেষ্টন কার সাপেক্ষে? সমাজ বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় হয়, পরিবেষ্টন হল প্রধানত মানুষের— হয় ব্যক্তি মানুষের সাপেক্ষে অথবা গোষ্ঠী বা সমাজবদ্ধ মানুষের সাপেক্ষে।

আবার, 'পরিবেশ' কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'environment' ইংরেজি 'environment' শব্দটির মূলে রয়েছে ফরাসি শব্দ 'environ' যার অর্থ হল 'পার্শ্ববর্তী এলাকা' বা 'চারপাশ', ফরাসি ক্রিয়াপদ 'environer' এর অর্থ হল ঘিরে ফেলা। ইংরেজিতে 'environment' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'The surroundings' (The Concise Oxford Dictionary of Geography, Mayhew and Penny, 1992)।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় 'environment' হল, আমাদের চারপাশে যা অবস্থান করে তাই, অন্যভাবে বলা যায়, যে বাস্তব পরিধির ভেতরে আমরা বসবাস করি, সেই পরিধির অন্তর্গত বস্তুক্ষেত্র। বস্তুক্ষেত্র অর্থাৎ আমাদের বসবাসের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরে যেগুলি রয়েছে সেগুলি হল পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান। পরিবেশ বলতে কিন্তু এই উপাদানগুলির সমষ্টি নয়, উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়ার মিলিত এক সত্তা।

ইউনাইটেড নেশনস্ এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছে "পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠাসেই প্রাকৃতিক ও জীবমণ্ডলীয় প্রণালীকে বোঝায় যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলি বেঁচে থাকে, বসবাস করে।"

পরিবেশ বিজ্ঞানী বটকিন এবং কেলার ১৯৯৫ সালে তাঁদের 'Environment Science' নামক গ্রন্থে পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে "জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবনচক্রের যে কোন সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।"

মনোবিদ উডওয়ার্থ-এর মতে "Environment covers all the outside factors that have acted on the individual since he began life." অর্থাৎ তাঁর মতে "পরিবেশ বলতে সকল বাহ্যিক উপাদানকে বোঝায় যেগুলি জীবনের শুরু থেকে শিশুর উপর ক্রিয়াশীল হয়।" এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, মনোবিদ্যায় পরিবেশকে নিষ্ক্রিয় কোন সত্তা হিসাবে নয়, তার সক্রিয় সত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক মনোবিদ্যায় বলা হয়েছে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে উত্তেজিত করতে সক্ষম এমন সমস্ত উদ্দীপকের সমবায়ই হল পরিবেশ।

মনোবিদ ডগলাস এবং হল্যান্ড এর মতে "The term environment is used to describe, in the aggregate, all the external forces influences and conditions which effect the life, nature, behaviour and the growth, development and maturity of the organism." এই সংজ্ঞা অনুযায়ী পরিবেশ হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পরিবেশের অন্তর্গত কোন বিশেষ বস্তু একজনের নিকট সক্রিয় উদ্দীপক হলেও অন্যজনের ক্ষেত্রে না-ও হতে পারে। সুতরাং পরিবেশের অন্তর্গত কোন বস্তুর কোন একজন ব্যক্তিকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম হলে তবেই তা পরিবেশের অন্তর্গত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, শিশুর জীবন শুরু (ভ্রূণানু) হওয়ার পর থেকে যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমন্বয় শিশুর উপর ক্রিয়াশীল তাদের ঐক্যবদ্ধ সত্তাকেই বলা হয় পরিবেশ। শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিবেশকে আরো ব্যাপক অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এক্ষেত্রে, পরিবেশ বলতে বোঝায় শিশুর পারিপার্শ্বিক সেই উদ্দীপক পরিস্থিতি যার প্রভাব শিশুর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটায় এবং তার আচরণ ধারায় পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করে।

৫.৩.২ পরিবেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Environment) :

আমরা আগেই জেনেছি পরিবেশ শিশু বা ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশ সম্পর্কে আরো একটু জানার জন্য প্রয়োজন তার বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হল :

১) সক্রিয়তা : পরিবেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তা সক্রিয় এবং ক্রিয়াশীল। শিশুর জগতে যা কিছু বিষয় শিশুকে বা ব্যক্তিকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম তা সবই পরিবেশের উপাদান।

২) ব্যাপকতা : মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী, জন্মের পূর্ব মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিশুর উপর ক্রিয়াশীল বা প্রভাববিস্তারকারী সমস্ত উপাদানই তার পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্ব প্রকৃতির যত দূরের বস্তুই হোক্ না কেন যা তাকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম, যার প্রভাবে শিশু সাড়া দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে তা সবই শিশুর পরিবেশে স্থান পায়।

৩) পরিবর্তনশীলতা : পরিবেশ সতত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার হার কখনো কম কখনো-বা বেশি। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনশীলতার নিয়ন্ত্রক কখনো প্রকৃতি, কখনো মানুষ।

৪) মিথষ্ক্রিয়তা : পরিবেশের উপাদানগুলি যেমন শিশু বা ব্যক্তিজীবনে প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, শিশুও তেমনই পরিবেশকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে। ব্যক্তি এবং পরিবেশের মধ্যে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিই মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া নামে পরিচিত।

৫) বিকাশধর্মীতা : শিশু বা ব্যক্তি তার যে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে, তার জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট কিছু শক্তির। এই শক্তি সে পায় তার পরিবেশ থেকেই। পরিবেশের এই শক্তি শিশুকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে শিশুর দেহ, মন, আবেগ তার সামগ্রিক সত্তা বিকশিত হয়, তার আচরণ ধারায় পরিবর্তন আসে, শিশুর জীবন সুরক্ষিত থাকে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-১ (Check your progress-1)

নির্দেশ : আপনার উত্তর নীচের দেওয়া জায়গায় লিখুন।

এই এককের শেষে দেওয়া উত্তররের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

১. পরিবেশের একটি সংজ্ঞা দিন।

---

২. মিথষ্ক্রিয়া কাকে বলে?

---

৩. পরিবেশের দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

৫.৩.৩ পরিবেশের প্রকার ভেদ (Types of Environment) :

বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশকে ভাগ করেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ভৌগোলিক ভূমি-ব্যবহার (land-use) বিশেষজ্ঞ এলিস কোলম্যান (Alice Coleman) ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে ভূ-দৃশ্যকে ভূমি ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিচার করেছেন, সেই ধারণা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে মোট পাঁচ ধরনের বড় পরিবেশ বা পরিবেশ অঞ্চল দেখা যায়। সেগুলি হল :

১) আদিম পরিবেশ (Wild Environment) : আদিম অরণ্য, উষ্ণ ও শীতল মেরু অঞ্চল, তুন্দ্রা অঞ্চল, আদিম তৃণভূমি, মহাদেশীয় হিমবাহ আবৃত এলাকা, সু-উচ্চ ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, জনহীন উপকূল ভাগ, জনহীন দ্বীপ ইত্যাদি এই পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্গত।

২) গ্রামীণ ও আদিম ভূ-দৃশ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পরিবেশ (Rural fringe environment) : অরণ্যের প্রান্তবর্তী গ্রামীণ অঞ্চল, মরুপ্রান্তবর্তী গ্রাম, মরূদ্যানের বসতি অঞ্চল এই পরিবেশের অন্তর্গত।

৩) গ্রামীণ পরিবেশ (Rural Environment) : অস্থায়ী কৃষিভিত্তিক গ্রাম, নিবিড় জীবিকাশ্রয়ী কৃষি-অঞ্চল, মৎস সংগ্রহকারী ও কণ্ঠ সংগ্রহকারী গ্রাম অঞ্চল, খনিভিত্তিক গ্রাম, ব্যাপক কৃষি-খামার ইত্যাদি এই ধরনের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

৪) গ্রাম-পৌর উপকণ্ঠের পরিবেশ (Rural fringe environment) : কোনো শহরাঞ্চল এর প্রান্তবর্তী গ্রাম-সংলগ্ন অঞ্চল এই ধরনের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়।

৫) পৌর পরিবেশ (Urban Environment) : কোনো নগরের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল, নগরের ঘনসন্নিবিষ্ট বসবাস অঞ্চল, নগরের শিল্পাঞ্চল এই ধরনের পরিবেশের অন্তর্গত।

পরিবেশের উপাদানগুলির ভিত্তিতে আবার পরিবেশকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ (natural environment)

(২) সাংস্কৃতিক পরিবেশ (cultural environment)

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment) : ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানে মানুষের বাসস্থানের যে প্রাকৃতিক অবস্থা থাকে, সাধারণভাবে তাকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ বললে যে ভূদৃশ্য ফুটে ওঠে তার মধ্যে থাকে মাটি, জল, বাতাস, জলবায়ু, পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল, মরুভূমি এবং সজীব প্রাণ। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের দু'টি প্রধান অংশ হল জড় পরিবেশ আর সজীব পরিবেশ।

(i) জড় পরিবেশ : প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত প্রানহীন যে সমস্ত বস্তুগুলির সমাবেশ সজীব প্রানের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে জীবনীশক্তিকে সঞ্চালিত করে তাকে জড় পরিবেশ বলে। এই জড় পরিবেশ আবার দু'রকমের হয় স্বাভাবিক জড় পরিবেশ আর কৃত্রিম জড় পরিবেশ। স্বাভাবিক জড় পরিবেশ গঠনকারী বস্তুগুলি প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি লাভ করে কিন্তু কৃত্রিম জড় পরিবেশ গঠনকারী বস্তুগুলি মানুষের দ্বারা সৃষ্ট।

(ii) সজীব পরিবেশ : প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত যে সমস্ত বস্তুগুলির মধ্যে সজীব প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে সজীব পরিবেশ। সজীব পরিবেশ আবার দুই প্রকার। উদ্ভিজ্ব পরিবেশ এবং প্রাণীজ পরিবেশ। উদ্ভিজ্জ পরিবেশ গড়ে ওঠে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদিকে নিয়ে আর প্রানীজ পরিবেশ গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের নিয়ে।

(২) সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment) : মানুষের সমাগ্রিক জীবনধারার বিভিন্ন অংশকে নিয়ে গড়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ। সাংস্কৃতিক পরিবেশের মূল উপজীব্য বিষয় হল সংস্কৃতি। কিন্তু

সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? এডওয়ার্ড টেলর (Edward Tylor) এর মতে, সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সেই জটিল সামগ্রিক অবস্থা যার মধ্যে সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের অর্জিত সমস্ত জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য সব রকম সার্মথ্য অন্তর্ভুক্ত ("that complex whole which includes knowledge, belief, morals, law, custom and any other-capabilities acquired by man as a member of society")। অধ্যাপক ম্যালিনস্কির মতানুসারে "সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু যেমন— যন্ত্রপাতি, মনস্তত্ব, সামাজিক ও শিল্প প্রকরণ।" আবার বিডনির মতে, সংস্কৃতি হল— কৃষিকার্যের পদ্ধতি ও প্রকরণ শিল্পের উৎপাদন, সামাজিক সংগঠন এবং মানসিক প্রকরণের সমন্বয়।

শিক্ষাবিদ ম্যাকেঞ্জির মতে, "Culture which is generally taken to denote education in its larger sense— the sense in which it is the end of life, rather than the preparation for life. ……it is the deveopment of the spiritual nature of man."

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায়, সামাজিক বিচারে মানুষের জীবনধারাকে বলা হয় সংস্কৃতি। সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ের এক মিশ্র ও জটিলরূপই হল সংস্কৃতি। এই সব বিষয়ের মধ্যে পড়ে সমাজ অন্তর্ভুক্ত সমষ্টিগত জ্ঞান, নীতিবোধ, বিশ্বাস, আইনকানুন, প্রথা, লোকাচার, সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন অর্জিত অভ্যাস ও দক্ষতা। সমাজবদ্ধ মানুষের যা কিছু তার সবই হল তার সংস্কৃতির পরিচায়ক।

এই মানবীয় বা সাংস্কৃতিক পরিবেশের আবার দু'টি ভাগ। প্রথমটি হল মানুষের দ্বারা তৈরি বাসস্থান, পথঘাট, রেলপথ, মাঠ, খাল-বিল, জলাশয় ইত্যাদির সমবায়ে গঠিত নির্মিত পরিবেশ (built environment) এবং মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক পরিবেশ (social environment)। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে মানুষের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় ঐ নির্দিষ্ট স্থানে মানুষের সামাজিক পরিবেশ।

উপরে আলোচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবীয় পরিবেশ বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছাড়াও, বর্তমানে পরিবেশবিদরা পরিবেশের অন্য দুই ধরনের পরিবেশের কথা বলেন, সেগুলিহল— ব্যক্তিনিরপেক্ষ পরিবেশ (objective environment) এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ পরিবেশ (subjective environment)।

ব্যক্তিনিরপেক্ষ পরিবেশ : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠীর সংবেদন, প্রত্যক্ষণ এবং আবেগ নিরপেক্ষভাবে সেই নির্দিষ্ট স্থানের যে রূপ তা হল ব্যক্তি নিরপেক্ষ পরিবেশ।

ব্যক্তিসাপেক্ষ পরিবেশ : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের পরিবেশের ব্যক্তিনিরপেক্ষ রূপ যাই হোক না কেন, যদি সেই স্থানে অথবা অন্য কোনো স্থানের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বা মনে পরিবেশের রূপ একাধিকভাবে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয় তবে সেই পরিবেশকে ব্যক্তিসাপক্ষে পরিবেশ বলা হয়। যেমন, কারো দৃষ্টিতে মরু অঞ্চলের নির্জন পরিবেশ বেশ আকর্ষণীয় অথবা ভালো লাগতে পারে, আবার কারো দৃষ্টিতে তা মোটেই আকর্ষণীয় অথবা ভালো নাও লাগতে পারে। কোনো পরিবেশের সঙ্গে কোনো কোনো মানুষের বিশেষ বিশেষ ধরণের আবেগ-বন্ধনী (emotional bonding) থাকতে পারে; যেমন একসময় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উঠলে মানুষের মনের মধ্যে এক আনন্দ শিহরণ জাগিয়ে ভূ-স্বর্গের ভাবনায় ভাবিত করে তুলত, কিন্তু বর্তমানে তা আর হয় না বরঞ্চ বিপদ সংকুল এক পার্বত্যঅঞ্চলের ভাবনায় ভাবিত করে তোলে। এইভাবে কোনো পরিবেশ কোনো ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে যে রূপ প্রতিভাত হয় তাকেই বলা হয় ব্যক্তিসাপেক্ষ পরিবেশ।

৫.৩.৪ পরিবেশের উপাদান (Components of environment) :

আগেই আলোচনা করা হয়েছে একজন ব্যক্তি তার জীবনকালে তার চতুর্পার্শ্বস্থ যত রকমের উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় তাদের সমন্বয় হল তার জীবন পরিবেশ। পরিবেশের অন্তর্গত এই সমস্ত উদ্দীপক বা অংশগুলিই পরিবেশের উপাদান। পরিবেশের এই সমস্ত উপাদানগুলিকে নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

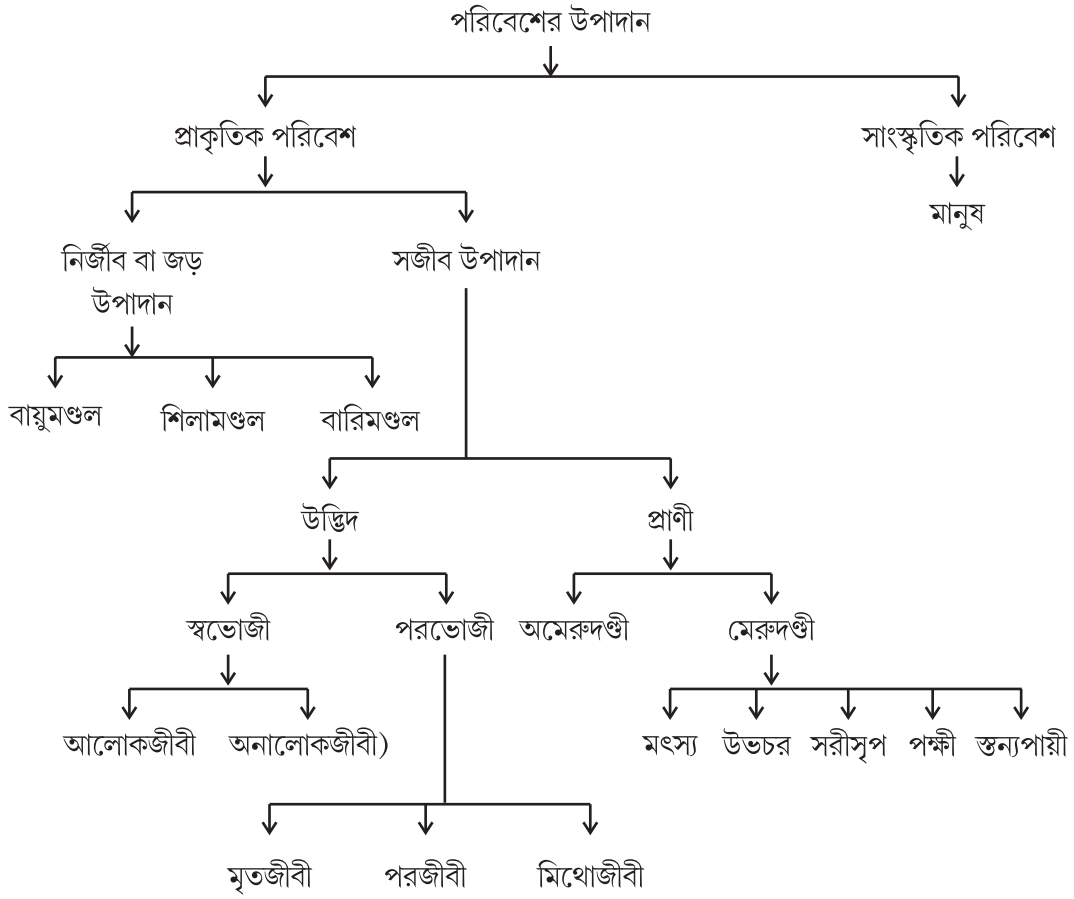

৫.৪ মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধ (Relation between man and environment)

'মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধ' এর প্রচলিত অর্থ হল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ। মানুষ ও পরিবেশ (প্রাকৃতিক পরিবেশ) এর মধ্যে সম্বন্ধ কীরূপ অর্থাৎ মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন তার বিশদ বিবরণ ভূগোল এর একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে

এবং কতখানি মানুষকে বা মানুষের কর্মকে বা কর্মচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার মানুষই বা তার কর্মচিন্তা বা কর্মের দ্বারা প্রকৃতিকে কীভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করে সে বিষয়ে একটা দায়িত্ব বর্তায় ভূগোল বিজ্ঞানীর অথবা পরিবেশ বিজ্ঞানীর। মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধের বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিচে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

মানুষ ও পরিবেশ এর মধ্যে সম্বন্ধের বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব

১) থিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি

২) জিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি

৩) উইওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি

৪) বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাবাদ

৫) নব নিয়ন্ত্রণবাদ

নিচে তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১) থিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি (Theocratic view) :

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহু প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (যেমন ভারতবর্ষ, মিশর, ব্যবিলন, গ্রীস) মানুষের সমাজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। মনে করা হত এই বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। মানুষ সমেত বিশ্বপ্রকৃতি এক চিরায়ত প্রাকৃতির ও নৈতিক নিয়মের অধীন। এই চিরায়ত বা শাশ্বত নিয়মই হল ধর্ম, যা মানুষ আর প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। এই শাশ্বত নিয়মের ভিত্তিতেই সৃষ্ট বিশ্বজগতে মানুষের বেঁচে থাকা এবং মানুষেরই চেতনার উন্নতির জন্য শৃঙ্খলা পরায়ণ প্রকৃতিকে ঈশ্বরের দান হিসাবে গ্রহণ করা, প্রকৃতির সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সেই প্রকৃতিকে ব্যবহার করা। মানুষের চেতনার বিকাশের জন্যই এই বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি, মানুষের সাথে প্রকৃতির এই উদ্দেশ্যমূলক সম্বন্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গি বা তত্ত্বকে গ্রিফিথ টেলর (Griffith Taylor) নাম দিয়েছেন থিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন কার্লরিটার।

২) জিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি (Geocratic view) :

এই মতবাদ অনুসারে মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধে প্রকৃতিই মুখ্য ও সক্রিয়, মানুষের ভূমিকা গৌণ। প্রকৃতিকে এখানে একটি স্বাধীন সত্তা হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং প্রকৃতিকে চালনা করার ব্যাপারে কোনো অতি মানবিক সত্তা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হয়নি। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল, ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের জীবন ও কর্মপ্রক্রিয়ায় যে সমস্ত বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়, সেইসব রূপের বিভিন্নতার কারণ হল প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ; বাসস্থান এবং মানুষের জীবিকা ও সামাজিক ব্যবস্থা এক রকমের নয়। এর মূল কারণ হল বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলি বিভিন্ন। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের জীবনও কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন। পৃথিবীর কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের মানুষের জীবন প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্ধারণ করে দেয় সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ট। এই মতবাদকে প্রাকৃতিক পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদও বলা হয়।

৩) উইওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি (Weocratic view) :

এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন পেলে ভিদাল দ্য লা ব্লাশ নামে এক ফরাসী ভূগোলবিদ ও লুসিয়াঁ ফ্যভ্র্ নামে এক ফরাসী ঐতিহাসিক। ভিদাল এর মতে, মানুষ আসলে প্রকৃতিরই অংশ, জীবন্ত সৃষ্টি। প্রকৃতি হল মানুষের উপদেষ্টা স্বরূপ। ভিদালের মতে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের

যে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের ধারা বা ধাঁচ লক্ষ্য করা যায় তার মূল কারণ প্রকৃতি ও মানুষের মিলিত পারস্পরিক সহযোগিতা। ঐতিহাসিক ফ্যভ্র মতে, প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে বা মানব গোষ্ঠীকে এমন কতকগুলি সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে যাতে মানুষের কর্মজীবনে কতকগুলি সুযোগ বা সম্ভাবনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অন্যদিকে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টায় কী করবে আর কী করবে না তা নির্ভর করে মানুষের পছন্দ বা অপছন্দেরওপর বা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। মানুষের এই পছন্দ, অপছন্দ নির্ভর করে তার সাংস্কৃতি, কলা-কৌশলগত উন্নতি এবং সমাজের মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এখানে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্বন্ধের ভিত্তি ধরা হয়েছে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে। এজন্য টেলর এই দৃষ্টিভঙ্গিটির নামকরণ করেছেন 'উইওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি' (weocratic view) অর্থাৎ যার মূল কথা 'আমাদের শাসন'। এখানে 'আমাদের' বলতে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ের মিলিত অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

৪) বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা বাদ (Scientific probabilism) :

ভৌগোলিক O. H. K. Spate প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধকে নির্দেশ করলেন রাশিবিজ্ঞানের সম্ভাবনাবাদ-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে। স্পেট-এর মতানুসারে, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে না ঠিকই কিন্তু তা মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, কোনো কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের কোনো কোনো কর্মপ্রচেষ্টার সম্ভাবনা তার অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি থাকে। এই পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ দাঁড়ায় বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাভিত্তির উপর।

৫) নবনিয়ন্ত্রণবাদ (Neo-determinism) :

ভূগোলবিদ গ্রিফিথ টেলর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেন। টেলর-এর মতানুসারে, মানুষের কর্ম প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম নিয়ন্ত্রক না হলেও তার প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। অর্থাৎ মানুষের সাপেক্ষে তার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বিশাল ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ প্রকৃতির ক্ষমতাকে বা প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। কোনো বড় শহরের ট্রাফিক পুলিশের ন্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাকে একটি নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সেখানে মানুষের অবাধ স্বাধীনতার স্থান নেই। টেলরের এই মতবাদটি 'Stop-and-go determinism' নামেও পরিচিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রকৃতি মানুষকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম বা সক্ষম নয়, বা মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাতে কতখানি সুযোগদেয় কি দেয় না, সেদিক থেকে যেমন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধকে বোঝবার চেষ্টা হয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষ প্রকৃতিকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছে, প্রকৃতির ওপর তার প্রভাব কতখানি বিস্তার করতে পেরেছে সেদিক থেকেও মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূগোলবিদ ল্যাডিস কে. ডি. ক্রিস্টফ (Ladis K. D. Kristof) তাঁর একটি গবেষণাপত্রে মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধে বিষয়ে তিনটি ধারণার উল্লেখ করেছেন—

ক) প্রকৃতির সাথে মিলন ('fusion with nature')

খ) প্রকৃতিকে শাসন ('rule over nature')

গ) প্রকৃতিকে জয় ('conquest of nature')

ক) প্রকৃতির সাথে মিলন : এই ধারণাটি মূলত একটি আধ্যাত্মিক ধারণা থেকে এসেছে। এই ধারণায় সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের প্রকাশ বলে মেনে নেওয়া হয়। প্রকৃতির সাথে মানুষের বই সম্বন্ধটি

দেখা যায় সেইসব সংস্কৃতিতে যেখানে মানবীয় জগৎ আর প্রাকৃতিক জগৎকে আলাদা করে দেখা হয় না। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে এক পরিপূরক ধারণাকে স্থান দেওয়া হয়। প্রাচীন চীনা ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই ধরনের সম্বন্ধ দেখা যায়।

খ) প্রকৃতিকে শাসন : এই ধরনের মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ দেখা যায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে। ঐতিহ্য অনুসারী পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশ্বাস করে ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্ব প্রকৃতি সুসংগত, উদ্দেশ্যমূলক এবং উঁচু-নিচু স্তরে স্তরায়িত। এখানে জড় প্রকৃতির স্থান মানুষের নীচে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির কারণ মানুষের সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যপূরণ।

গ) প্রকৃতিকে জয় : মানুষ ও প্রাকৃতির মধ্যে এই ধরণের সম্বন্ধ বিকাশ লাভ মূলত শিল্প বিপ্লবের পর। জড়বাদী দর্শনও ধনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতি কখনোই সুসংগত '(harmonius)' নয়, বরং মানুষের কাজ হল বিশৃঙ্খল প্রকৃতিকে বশ করে সুশৃঙ্খল করে তোলা। প্রকৃতিকে জয় করা অর্থ হল বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্বারা প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে তোলো।

আজকের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথিবীর স্থলপৃষ্ঠে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় অবলুপ্ত। বেশীরভাগ স্থানে পরিবেশ বলতে যা দেখতে পাওয়া যায়, তা হল এক ধরণের রূপান্তরিত পরিবেশ, বলা যেতে পারে মানব-পরিবর্তিত পরিবেশ। সুতরাং 'প্রকৃতিকে জয় করা' মানুষের প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিন্তু প্রকৃতির এই সাম্রাজ্য জয় করে মানুষের প্রাপ্তি কী? মানুষ যা পেয়েছে তা হল বিষয়গত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মতৃপ্তি, কিন্তু তার পরিবর্তে মানুষকে যে মূল্য দিতে হচ্ছে তার পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ দূষণের ছড়াছড়ি— বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মাটিদূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারে বাতাসের গড় উষ্ণতা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে দেখা দিয়েছে বিশ্বউষ্ণায়ণ (global warming), ওজোন স্তরের ভেতরে যে ছোট বড় ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রশস্ত হয়েছে এই মানবগোষ্ঠীরই মৃত্যু গহ্বরের পথ। মানুষ আজ ভয়ংকর সংকটের মুখোমুখি, মানুষের নিজেরই জীবন আজ সামগ্রিকভাবে বিপন্ন।

এই বিপন্ন মানুষের পরিস্থিতি দেখে বিংশ শতকের সাতের দশক থেকে উদ্বিগ্ন কিছু বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সার্বিকভাবে চিন্তা শুরু করেছেন। পৃথিবীর এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পরিবেশ সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে পরিবেশবাদ (environmentalism)।

পরিবেশবাদ বলতে কী বোঝায়? মানবগোষ্ঠীর কাজের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে, এই বিষয়ে যে সচেতনতা তাকেই নির্দেশ করে পরিবেশ বাদ। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পরিবেশবাদ এবং সাংস্কৃতিক তত্ত্ব' বা (Environmentalism and Cultural Theory) নামক গ্রন্থে কে. মিলটন (K. Milton) লিখেছেন এনভাইরনমেন্টাল জয়, "refers to a concern that the environment should be protected, particularly from the harmful effects of human activities."

পরিবেশবাদীদের বিভিন্ন মতবাদে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা একমত হয়, প্রাকৃতিক পরিবেশকে হয় কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। পরিবেশের সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মানুষের রক্ষার উপায় হল পরিবেশ-বান্ধব (eco-friendly) দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী অনুসরণ করা। তাহলেই এই পৃথিবী হবে শিশুর বাসযোগ্য ভূমি।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-২ (Check your progress-2)

নির্দেশ : . . . . . একই বিষয় হবে।

ক) পরিবেশের কত প্রকার?

খ) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলির নাম লিখুন।

গ) নবনিয়ন্ত্রণবাদ কি খুব সংক্ষেপে লিখুন।

৫.৫ পরিবেশগত অনুভূতি বা পরিবেশগত বেদন (Environmental perception)

পরিবেশগত অনুভূতি বা পরিবেশগত বেদনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'environmental perception'; environmental কথাটির অর্থ হল পরিবেশগত এবং ইংরেজি perception কথাটির মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থ হল প্রত্যক্ষণ। Perception শব্দটি ইংরেজি feeling এর প্রায় সমার্থক, সেই অর্থে perception শব্দটিকে বলা যেতে পারে 'অনুভূতি' বা 'বেদনা'। 'বেদনা' বলতে বোঝায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা থেকে উদ্ভূত সংবেদন থেকে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের অনুভূতি। সুতরাং 'environmental perception' বা 'পরিবেশগত বেদন' শুধুমাত্র পরিবেশ প্রত্যক্ষণই নয়, বরং তার মধ্যে থাকে বিশেষ 'অনুভূতি' বা বেদনা।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে পরিবেশ শুধু ব্যক্তি নিরপেক্ষ বা বিষয়গত (objective) নয়, তা ব্যক্তিসাপেক্ষ বা বিষয়ীগত (subjective) ও বটে। কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ইন্দ্রিয় সংবেদন তথা প্রত্যক্ষণের ভিতর দিয়ে যেভাবে অনুভূত হয়, তা-ই হল বিষয়ীগত পরিবেশ। কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পরিবেশটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে অথবা নিজের নিজের অনুভূতিতে গ্রহণ করতে পারে। পরিবেশে প্রকাশ পরিবেশগত বেদনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কোনো ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেন তাই হল সেই ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠীর পরিবেশগত বেদন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রূপ, সিদ্ধান্ত ও কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে তার পরিবেশগত বেদন।

পরিবেশগত বেদনকে নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায়ে বিচার করা হয় :

১) আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া (emotional response)

২) অভিমুখজনিত প্রতিক্রিয়া (orientative response)

৩) শ্রেণি বিভাজনকারী প্রতিক্রিয়া (classifying response)

৪) সংগঠনকারী প্রতিক্রিয়া (organizing response)

৫) চালনাকারী প্রতিক্রিয়া (manipulative response)

পর্যায়গুলি খুব সংক্ষেপে নিচে ব্যাখ্যা করা হল :

কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশ প্রথম পর্যায়ে মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর সামনে বিভিন্নধরনের উদ্দীপককে উপস্থিত করে। বিভিন্ন উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ আবেগ দেখা যায়। মানুষের এই আবেগ প্রধানত তিনটি— ভয়, ক্রোধ আর ভালোবাসা। ভয়ের মূলে যেমন থাকে পলায়ন প্রতিক্রিয়া (flight response), ক্রোধের মূলে তেমনই যোধন প্রতিক্রিয়া (fight response)। ভয়, ক্রোধ ও ভালোবাসা এই তিনটি দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ অভিমুখ নির্ধারণ করে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে মানুষ তার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্দীপককে শ্রেণি বিভাগ করে চতুর্থ পর্যায়ে শ্রেণিবদ্ধ বিভিন্ন উদ্দীপককে সংগঠিত করে বা বিন্যাস্ত করে। সংগঠিত উদ্দীপক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পঞ্চম পর্যায়ে মানুষ তার সামগ্রিক প্রতক্রিয়াকে চালিত করে। পরিবেশগত বেদনই মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব (attitude) ও আচরণকে (behaviour) নির্ধারিত করে। এরফলেই পরিবেশের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি, সমবেদনার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি, ভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, বিরক্তি বা ক্ষোভের দৃষ্টিভঙ্গি, ভালো লাগার দৃষ্টিভঙ্গি। আবার কখনো কখনো এই দৃষ্টিভঙ্গির হতে পারে উদ্দেশ্যমূলক, শোষণমূলক, সাবধানমূলক কিংবা বন্ধুত্বপূর্ণ। পরিবেশের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব যেমন মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর আচরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশ।

৫.৬ শিশুর পরিবেশ (Environment of child)

ফয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সুবাদে আজ এ কথা প্রতিষ্ঠিত এবং বহুজন স্বীকৃত যে মানবজীবনের গুরুত্ব সময় হল শৈশবকাল। শৈশবের অভিজ্ঞতারাজিই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ভিত্তিভূমি রচনা করে। বস্তুত, অভিভাবক-অভিভাববিকারাই শুধুমাত্র নয় আজকের বুদ্ধিজীবী সমাজ জীববিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিজ্ঞানী ও শিক্ষক সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে এই শিশু। তাই 'শিশু' আজ 'বহু বিষয়কেন্দ্রিক' (multi-disciplinary) ধারণা এবং গবেষণার বিষয়বস্তু (subject matter of research)। যে পরিবেশে শিশুর নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত হয়, সেই শিশু বান্ধব পরিবেশ (child-friendly environment) নিয়ে সবার আগ্রহ ও চিন্তা। শৈশবকালীন যত্ন, তার শিক্ষা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ রচনার মাধ্যমে শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা কিভাবে সম্ভব তা-ই নিয়ে সকলেই চিন্তিত। কিন্তু এই 'শিশু' আসলে কী এবং 'শিশুর পরিবেশ' বলতেই বা কী বোঝায় সেই বিষয়ে আমরা একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো।

৫.৬.১ শিশুর ধারণা (Concept of child) :

'শিশু' কী? তা জানার জন্য কোনো একক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যাবে না। জীববিজ্ঞানীর কাছে, শিশু যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, সমাজবিজ্ঞানীর কাছে ঠিক সেইভাবে নয়, একটু ভিন্নভাবে, কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশু যে ভাবে প্রতিভাত হয়, শিক্ষকের কাছে ঠিক তেমনভাবে প্রতিভাত হয় না। সুতরাং 'শিশু'কে জানতে হলে তার যে সমস্ত 'সত্তা' পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতেই তাকে দেখতে হবে। পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা তাকে যেভাবে দেখতে চান, জানতে চান তা হল তার একক ও যৌথ সত্তার বিষয়কে কেন্দ্র করে। সেদিক থেকে শিশুর একক সত্তা বলতে বোঝায় তার 'জৈবিক সত্তা' অর্থাৎ জৈবিক ধারণায় শিশু (biological concept of child) এবং 'যৌথ সত্তা' বা 'সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্তা' অর্থাৎ 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণায় শিশু'। নিচে এই ধারণা দুটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল :

জৈবিক ধারণায় শিশু (Biological concept of child) :

বিশাল ও বৈচিত্র্যময় এই জীবজগতে প্রতিটি জীব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে, এই সময়কালকে বলা হয় জীবের জীবনকাল। জীবের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টি হল তার জীবনকাল। কিন্তু জীব শুধু মাত্র তার জীবনকালেই সীমাবদ্ধ নয়, সে বেঁচে থাকে তার নির্দিষ্ট প্রজাতিকে রক্ষাড় করার মাধ্যমে। জীবের প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা হয় জীবের জনন প্রক্রিয়ার দ্বারা নতুন বংশধর সৃষ্টি মাধ্যমে। অবশ্য বংশধরদের মধ্যে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়। এই কারণেই বাঘের সন্তান বাঘ, হরিণের সন্তান হরিণ, খরগোসের সন্তান খরগোষ এবং মানুষের সন্তান মানুষই হয়। কাজেই পিতা-মাতার সবরকম বৈশিষ্ট্যই (দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি) সন্তান-সন্ততির মধ্যে বর্তায় বা সঞ্চারিত হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সঞ্চরণ ঘটে তাকে বলা হয় বংশগতি (heredity)। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায় যে তিনি তাঁর শুভ্রকান্তি বা গৌরকান্তি অথবা আয়তনয়ন পেয়েছেন তাঁর মাতা বা পিতার কাছ থেকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরণের বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ পিতার জননকোষ বা শুক্রানু (sperm) এবং মাতার জননকোষ বা ডিম্বানু (ovum) পরস্পর মিলিত হয়ে (নিষেক) যে জাইগোট বা ভ্রূণানুর সৃষ্টি হয় তার থেকেই জন্মলাভ করে মানবশিশু। সন্তানের বৈশিষ্ট্যগুলি এই জননকোষ অর্থাৎ শুক্রানু বা ডিম্বানুর কোনটির মধ্যেই থাকে না, যা থাকে তা হল গৌরকান্তি বা আয়তনয়ন গঠনকারী জীনগুলি, তার সঙ্গে আরো কিছু নিয়ন্ত্রক। ঐ জীন ও নিয়ন্ত্রকগুলির কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীকালে বিশেষ বিশেষ শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ ঘটে। আবার জননকোষ বা germ cell-এর মধ্যে যে প্রোটোপ্লাজম অবস্থান করে তাকে বলা হয় 'জার্মপ্লাজম'। এই জার্মপ্লাজমের মধ্যেই অবস্থান করে জীনগুলি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি পিতা-মাতা থেকে সন্তান সন্ততির মধ্যে জার্মপ্লাজমের সঞ্চরণ হল বংশগতি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে প্রতিটি শারীরিক, মানসিক ও অমান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মূলে এক একটি জীন থাকে না। প্রতিটি বৈশিষ্ট্য অসংখ্য জীন-এর সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল।

নিষেক ক্রিয়ার পর সৃষ্ট জাইগোট এরপর ক্রমান্বয়ে মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বিভক্ত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গঠিত হয় বহুকোষী অথবা প্রাপ্ত একটি পূর্ণাবয়ব মানব ভ্রূণ। বিকাশের এই পর্যায়ে মানবভ্রূণ অবস্থান করে তার মাতৃ জঠরে অর্থাৎ মাতৃ জরায়ুতে। মাতৃ জরায়ুতে যখন একটি ডিম্বাণু একটি শুক্রানুকে নিষিক্ত করে তখন তৈরি হয় একটি মাত্র ভ্রূণ, যখন একই সঙ্গে জরায়ুর দুই

পার্শ্বে অবস্থানকারী দুটি ডিম্বানুকে পৃথক পৃথকভাবে নিষিক্ত করে দুটি পৃথক পৃথক শুক্রানু তখন তৈরি হয় দু'টি পৃথক ভ্রূণ যারা 'যজম' নামে পরিচিত হয়, কিন্তু অসমকোশী বা অসদৃশ যমজ (non-identical twins)। আবার যখন একটি সদ্য গঠিত জাইগোট কোষ বিভাজন পর্যায়ে হঠাৎ দু'টি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পৃথক ভাবে দু'টি ভ্রূণ উৎপন্ন করে তখন তারা যে যে দুটি মানবশিশুতে পরিণত হয় তাদের বলা হয় সমকোষী বা সদৃশ যমজ (identical twins)।

এই পূর্ণাবয়ব মানব ভ্রূণ যখন ভূমিষ্ঠ হয় অর্থাৎ মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথক ও স্বাধীনভাবে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় তখন তাকেই বলা হয় সদ্যজাত মানবশিশু। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয় তার সামগ্রিক দৈহিক সত্তা। যেমন— পেশীকঙ্কাল তন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, সংবহন তন্ত্র, রেচন তন্ত্র, প্রজননতন্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমেত স্নায়ুতন্ত্র। সেইসব তন্ত্রগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালে গঠিত হয় হরমোন তন্ত্র। এই সমস্ত তন্ত্রগুলির অন্তর্গত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি থাকে অবিকশিত বা বিকাশমান পর্যায়ের কোন একটি দশায়। পরিণতি লাভের পর মানবশিশু (ছেলে বা মেয়ে) টিকে আমরা পাই একজন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত বয়স্কের পুরুষ বা নারী হিসাবে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণায় 'শিশু' (Sociological and cultural concept of child) :

শারীরতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে যেমন দেখা যাবে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে পরস্পর সম্পর্কিত, তেমনি একটি সমন্বিত বিন্যাসে সক্রিয়ও। অর্থাৎ মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্রে সু-সমন্বিতভাবে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা (system) তৈরি করে দিয়েছে। গিওর্গ সিমেল অনুরূপভাবে বলেছেন যে, ব্যক্তি-মানুষ পরস্পর পরস্পরের ওপর যে সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলে তাকেই বলা হয় সমাজ। এই মর্মে তিনি মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন স্বার্থ চরিতার্থ বা উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলেও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির আচরণে একটা সমতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সিমেলের মতে, বিভিন্নতা সত্ত্বেও কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি বা কর্মপন্থার ভিত্তিতে মানুষের গোষ্ঠীগত জীবন অক্ষুণ্ণ রাখার মিথষ্ক্রিয়াই হল সমাজ-ব্যবস্থা (social system)।

বাবা-মা'র পারিবারিক সীদ্ধান্তের অংশীদার হয়ে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়, তার জন্ম পরিবারেই। সমাজেই মানুষের জন্ম, সমাজের মধ্যেই তার বৃদ্ধি ও বিকাশ, সমাজেই তার জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিতৃপ্তি, সমাজেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি। সামাজিক কল্যাণ ও সংহতির মধ্যেই ব্যক্তিকল্যান ও তার অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব। ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম, শিক্ষা, নীতিবোধ সবাই সমাজ জীবনের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর দু'টি বিরোধী ধারণা নয়, বরং তারা একে অন্যের পরিপূরক। স্বনামধন্য বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পালের কথায় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে "ব্যক্তি ও সমাজ দুই এর একটাকেও অগ্রাহ্য করতে পারি না, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন একটা মত আছে, যেমন একটা বিচার আছে, বিবেক আছে, তেমনি সমষ্টিগতভাবে যে সমাজ তারও একটা মত আছে, বুদ্ধি আছে, বিচার আছে, বিবেক আছে। Individual conscience যেমন একটা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে social conscience বলেও একটা জিনিস আছে। Individual স্বাধীনতার যেমন একটা অধিকার আছে তেমনি সমষ্টিগত সমাজ শাসনের একটা অধিকার আছে। এটা যদি অস্বীকার করি তাহলে একদিকে যেমন ব্যক্তির উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়, তেমনি অন্যদিকে সমাজশৃঙ্খলা নষ্ট হয়, আর শৃঙ্খলা যদি না থাকে তাহলে ব্যক্তির সার্থকতা লাভ সম্ভব হয় না।"

সমাজ বিজ্ঞানীগণ এই মত পোষণ করেন যে, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আত্মিক সম্পর্ক

তাদের পারস্পরিক সক্রিয়তার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই সক্রিয়তার জন্যই কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এর ফলে তার অগ্রগতির ধারাও রক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের দ্বারা সামাজিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাই হল সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সংঘটিত সামাজিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে, তাদের চরিত্র বিচার করে ভিন্ন ভিন্ন নাম করণ করেছেন। এই রকমই কিছু মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া হল— মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction process), সামাজিকীকরণ (socialization), বিরোধিতা ও সহযোগিতার প্রক্রিয়া (Process of opposition and cooperation), সহাবস্থান (Accommodation), আত্তীকরণ (Assimilation) ইত্যাদি।

সুতরাং উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, মানবশিশু যেমন একদিকে একটি জৈবিক সত্তা নিয়ে জন্মায়, তেমনি অপরদিকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামাজিক সত্তা ও বর্তমান।

আমরা দেখলাম মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, একাকী কোন মানুষই দেখা যায় না। যে কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবেই সে জীবনযাপন করে, সেটাই তার পরিচিতি। মানুষের দৈনন্দিক জীবনধারায় যে সব কর্মপদ্ধতি দেখা যায় তা কতকগুলি সামাজিক বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত। মনুষ্যের প্রাণীদের মধ্যেও এই সামাজিক জীবনধারা লক্ষ্য করা যায়। বানর ও বনমানুষ দলবদ্ধ এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাসের প্রবণতা দেখায়। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে এদের মধ্যেও দেখা যায়। নিম্নস্তরের কিছু প্রাণী ও পতঙ্গের মধ্যেও সামাজিক ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। বেঁচে থাকার জন্য এরা বিভিন্ন কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করে থাকে, নিজেদের আশ্রয়ের জন্য যে বাসস্থান বা আশ্রয়স্থল রচনা করে তার মধ্যেও থাকে কারিগরি কুশলতা, শিল্পের নিদর্শন। মৌমাছি, পিঁপড়ে, উইপোকা এরা প্রত্যেকেই একটি করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় আপন আপন বাসস্থান রচনা করে। মানুষের সামাজিক জীবনধারার সাথে এদের সমাজিক জীবনধারাও বেশ কিছু মিল আছে। কিন্তু এই দুই সমাজধারার মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে অবশ্যই। মনুষ্যতর জীবদের জীবনধারায় যে কর্মপদ্ধতি তার মধ্যে পরিবর্তনের কোন চিহ্ন বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, গতানুগতিকভাবে একই সমাজধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। মানুষ তার আপন সামাজিক জীবনধারায় এনেছে কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন, পরিবেশের উপাদানকে সে কাজে লাগিয়েছে আপন চিন্তা চেতনায়। বিবর্তনের হাত ধরে মানুষ যে জায়গায় আজ এসেছে তাতে আছে তার নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। পরিবর্তনের ধারায় এনেছে গতিশীলতা। এই পরিবর্তন বা রূপান্তরই হল মানবসমাজের মূলগত লক্ষণ। এই পরিবর্তনের হাত ধরেই মানুষের জীবনে যে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ, তার মধ্যেই আছে সংস্কৃতিক মূল সূত্র। পরিবর্তনের প্রবণতাই মানুষের জীবনে সংস্কৃতির সূচনা করে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের সামাজিক জীবনধারায় এই সংস্কৃতির নিদর্শন ও প্রবাহ নেই। বাবুইপাখির বাসা নির্মাণ, মৌমাছির মৌচাক নির্মাণ,মাকড়সার জাল তৈরি প্রতিটির মধ্যে শিল্পনিদর্শন ও প্রযুক্তির ছোঁয়া থাকলেও সেগুলির মধ্যে পরিবর্তনের কোন প্রবণতাই নেই। এগুলি নির্মিত হয় ঐ সমস্ত প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) দ্বারা, পারস্পরিক শিক্ষাদানের ভিত্তিতে নয়। একমাত্র মানুষের সামাজিক জীবনধারায় কর্মপদ্ধতি অনুসন্ধান করলে পরিবর্তনের ধারা ও প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে। এই কারণেই মানুষের সংগঠিত কর্মপদ্ধতিতে সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। তাই একমাত্র মানুষই পৃথিবীতে সাংস্কৃতিক জীব, তার একটি সাংস্কৃতিক সত্তা আছে।

সুতরাং সামাগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মানুষের যেমন

একটি জৈবিক সত্তা আছে, তেমনি তার আছে সামাজিক সত্তা এবং সর্বোপরি তার সাংস্কৃতিক সত্তা। মানবশিশুকে দেখতে হবে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, তার বিকাশের ধারাও হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে।

৫.৬.২ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and development of child) :

বৃদ্ধি ও বিকাশ জীবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। জীবজগতে এই দু'টি স্বাভাবিক ঘটনা। মানবজীবনও এই দু'টি স্বাভাবিক ঘটনার মাধ্য পরিণতি হয়ে ওঠার দিকে অগ্রসর হয়। ভ্রূণানু গঠনের শুরু থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাটি বজায় থাকে। এই বৃদ্ধি বিকাশ বলতে কী বোঝায়? শিশুর জীবনে বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাটির গুরুত্ব কী? বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারায় শিশুর বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা কতখানি সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে এই অধ্যায়।

মানবজীবনে বৃদ্ধি ও বিকাশ দু'টি বিষয় গতিশীল পরিবর্তনের দু'টি ভিন্ন পরিস্থিতিতে নির্দেশ করে, এদের একটি হল পরিমাণ (Quantity) এবং অন্যটি হল গুণমান (Quality)। জীবন সঞ্চারের মুহূর্ত থেকে অর্থাৎ জাইগোট বা ভ্রূণানু গঠনের পর থেকে মানব শিশুর মধ্যে সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

জন্ম পূর্ববর্তী বৃদ্ধি

মাতৃজরায়ু প্রাচীরে জাইগোট (ব্লাস্টোসিস্ট) রোপিত হওয়ার 2 থেকে 3 সপ্তাহ পরেই মানবভ্রূণের আকৃতি আণুবিক্ষনিক স্তরেই থেকে গেলেও প্লাসেন্টা ও ভ্রূণ থলির বৃদ্ধি প্রথমদিকে খুব দ্রুত হয়। ভ্রূণের বৃদ্ধি এরপর বয়সের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা গেছে 12 সপ্তাহ পর এই দৈর্ঘ্য প্রায় 10 সেমি, 20 সপ্তাহে 25 সেমি এবং 40 সপ্তাহ পর প্রসবের সময় প্রায় 53 সেমি হয়। দৈর্ঘ্যের ঘনফলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণদেহের ওজনবৃদ্ধিও ঘটে সমানুপাতিক হারে। প্রথম সাড়ে পাঁচ মাসে ভ্রূণদেহের ওজন হয় 450 গ্রামের মত, গর্ভের শেষ তিন মাসে ভ্রূণদেহের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং গর্ভকালীন শেষ পর্যায়ে ভ্রূণের ওজন গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 3 কিলোগ্রামে। আবার অন্যদিকে গর্ভসঞ্চারের 4 সপ্তাহ পরে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হতে শুরু করলেও শ্বাসক্রিয়া শুরু হয় না। গর্ভস্থ ভ্রূণের মাঝামাঝি পর্যায়ে ভ্রূণ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বা ভ্রূণথলিরস গ্রহণ শোষণ করতে পারে।

এইভাবে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের কোষ বিভাজ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ, অঙ্গতন্ত্রের গঠন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এরপর পূর্ণাবয়ব মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এই গঠন প্রক্রিয়া ক্রমশ চলতে থাকে। এইভাবে মানবজীবনের যেকোনো মুহূর্তে মানুষের নিজস্ব জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলির এই পরিবর্তন তাকে পূর্বমুহূর্তের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে পৌঁছে দেয়। একেই জৈবিক দিক থেকে বলা হয় বৃদ্ধি। জীববিজ্ঞানীদের কথায় "Growth refers to the process of quantitative changes in various characteristics of the individual with reference to a frame of time." প্রচলিত জীব বিজ্ঞানের ধারণায় প্রাণীর এই আকার ও আয়তনগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হত বৃদ্ধি। কিন্তু আধুনিকালে জীববিজ্ঞানীগণ বৃদ্ধিকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে রাজী নন। জীববিজ্ঞানীগণ বর্তমানে প্রাণীর বৃদ্ধির সাথে সাথে অঙ্গের বা অঙ্গতন্ত্রের যে আকার ও আয়তনগত পরিবর্তন ঘটে তা প্রাণীটিকে পরিবেশের সাথে কতখানি মানিয়ে নিতে সাহায্য করছে অর্থাৎ তার ক্রিয়াশীলতাকে গুরুত্ব দিতে চান। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি তার গুণগত দিকটিকে কতখানি অগ্রসর ঘটাতে সক্ষম সেটিই প্রধান বিবেচ্য। বৃদ্ধির এই গুণগত দিকটিই হল বিকাশ বা বিকাশ প্রক্রিয়া (Developmental process)।

জীববিজ্ঞানের ভাষায় "Development is the continuous progressive qualitative change in the life of the child." অর্থাৎ ক্রমউন্নয়ণধর্মী সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া শিশুর জীবনধারায় সতত ঘটমান, তাই হল বিকাশ। সুতরাং বিকাশ এক ধরনের জৈবনিক প্রক্রিয়াই শুধু নয়, একটি সার্বিক প্রক্রিয়া। এই বিকাশ প্রক্রিয়ার বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল :

(i) বিকাশ হল সমগ্র জীবনব্যাপী ঘটমান প্রক্রিয়া অর্থাৎ ব্যক্তির জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে।

(ii) বিকাশ হল ব্যক্তিজীবনের ক্রমসমষ্টিমূলক প্রক্রিয়া। বিকাশের প্রতিটি পরবর্তী স্তর তার পূর্ববর্তী স্তরের সাথে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল।

(iii) ব্যক্তিজীবনে বিকাশের অভিমুখ সকল সময়ে সামগ্রিক অবস্থা থেকে বিশেষ অবস্থার দিকে অগ্রসরমান।

(iv) মানবজীবনের সকলের ক্ষেত্রেই বিকাশের ধারা প্রায় একইরকম অর্থাৎ সমরূপতা প্রদানি করে (ব্যক্তিগত বৈষম্যকে বাদ দিলে)।

(v) বিকাশ ব্যক্তিজীবনের নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী ঘটে থাকে এবং প্রতিটি স্তরের বিকাশ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

(vi) মানবজীবনে বিকারগত বৈশিষ্ট্যগুলি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সামগ্রিকভাবে সমন্বয়ধর্মী।

আধুনিক যুগে শিক্ষাকে মানুষের সমগ্র জীবনকাল ব্যাপী এক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মত বিকাশ প্রক্রিয়াও ব্যক্তিজীবনে ঘটমান প্রক্রিয়া। মানবজীবনে শিক্ষা ও বিকাশ প্রায় সমধর্মী এক প্রক্রিয়া, তাই বিকাশের মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুসরণ করে পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুর জীবনবিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিকাশ প্রক্রিয়া শিশুর জীবনে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

৫.৬.৩ শিশুর জীবনবিকাশের স্তর (Developmental stage of child's life) :

জীববিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত অমরাবিন্যাস সমন্বিত (Placental) প্রাণীদের মধ্যে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা দেখা যায়— জন্মপূর্ববর্তী (Pre-natal) এবং জন্মপরবর্তী (Post-natal) অবস্থা। মানুষের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য, অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে এই দু'টি অবস্থার স্থায়িত্বকাল অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক।

মনোবিজ্ঞানীরা মানবশিশুর জীবনবিকাশের স্তরকে বিভিন্ন দিক থেকে ভাগ করেছেন। মনোবিদ পিকুনাস (Pikunas) মানব জীবনের বিকাশের ধারাকে দশটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল (১) প্রাক-জন্মস্তর, (২) সদ্যজাত স্তর, (৩) প্রথম শৈশব স্তর, (৪) শৈশবের শেষ স্তর, (৫) প্রাথমিক বাল্যস্তর, (৬) মাধ্যমিক বাল্য স্তর, (৭) প্রান্তীয় বাল্যস্তর, (৮) যৌবনাগমের স্তর, (৯) প্রাপ্ত বয়স্ক স্তর, (১০) বার্ধক্য স্তর।

বয়সের দিক থেকে এই পর্যায়গুলিকে বিভক্ত করলে নিম্নরূপ বিভাগ পাওয়া যায়—

১) প্রাক-জন্মস্তর — প্রথম গর্ভসঞ্চারের পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত।
২) সদ্যজাত স্তর — জন্মের (ভূমিষ্ঠ) পর থেকে প্রথম চার সপ্তাহ পর্যন্ত।
৩) প্রথম শৈশব স্তর — একমাস থেকে দেড় বছর বয়স পর্যন্ত।
৪) শৈশবের শেষ স্তর — দেড় বছর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত।

৫) প্রাথমিক বাল্য স্তর — আড়াই বছর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত।
৬) মাধ্যমিক বাল্য স্তর — পাঁচ বছর থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত।
৭) প্রান্তীয় বাল্য স্তর — নয় বছর থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত।
৮) যৌবনাগমের স্তর — বারো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত।
৯) প্রাপ্ত বয়স্ত স্তর — একুশ থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত।
১০) বাধক্য স্তর — সত্তর বছরের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

মনোবিদ আর্নেস্ট জোনস্ (Earnest Jones) মানবশিশুর জীবনবিকাশের স্তরকে নিম্নরূপে ভাগ করেছেন :

১) শৈশব স্তর — এক থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত।
২) বাল্য স্তর — পাঁচ থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত।
৩) কৈশোর — বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত। এবং
৪) প্রাপ্তবয়স্ক — আঠারো থেকে জীবনের পরবর্তী বয়সকাল।

আর্নেস্ট জোনস-এর এই শ্রেণিবিভাগ মূলতঃ শিশুর জন্ম পরবর্তী বৃদ্ধিকে সূচিত করে। জন্ম পরবর্তী এই দশা বা ভাগগুলিকে আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

জন্ম পরবর্তী বৃদ্ধি (Post-natal Growth) :

1) **শৈশব অবস্থা (Infancy) :** জন্মলাভের পর থেকে শিশুর বৃদ্ধির গতি স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু নিজের অস্তিত্বের কারণে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে সদ্যজাত শিশু তার শ্বাসকার্য চালাতে শুরু করে দেয়। একমাসের পরই শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির হার আবার বৃদ্ধি পায়। শৈশবের শুরুতে শিশুর মাথা এবং ধড় অপেক্ষাকৃত বড় হয়। ধীরে ধীরে মাথাটি সোজা হয়ে ওঠে এবং শৈশবের বৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হতে থাকে। শৈশবের পরের দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃদ্ধিরগতি কিছুটা কমে আসে।

2) **বাল্য অবস্থা (Childhood) :** বাল্যাবস্থায়ও শিশুর বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে আসে। অবশ্য একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃদ্ধির প্রবণতা প্রায় সমরূপই থাকে। বাল্যাবস্থায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দুই দাঁতের উদ্‌গমন ঘটে থাকে। বাল্যাবস্থার শেষের দিকে স্থায়ী দাঁত উদ্গামের সূচনা হয়। এই সময় সামগ্রিক দৈহিক উচ্চতা অপেক্ষা প্রস্থেই বৃদ্ধি ঘটে বেশি। বাল্যের শেষের দিকে মাথার বৃহৎ আকার অনেকটা কমে যায় এবং দেহের রেখিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। বাল্যাবস্থার অন্তিম পর্যায়টি প্রাক্ যৌবনের সময় থেকে যৌবন আগমনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

3) **কৈশোর অবস্থা (Adolescent) :** বাল্য এবং প্রাপ্ত বয়স্ক এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী পর্যায় হল কৈশোর বা বয়ঃসন্ধি। দেহের অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন ধরনের হরমোন গ্রন্থির ক্ষরণের দ্বারা এই সময়কালটি প্রভাবিত। দেহের সামগ্রিক আয়তন ও গঠনে আসে পরিবর্তন। ছেলেদের তুলনায় এই পরিবর্তন মেয়েদের জীবনে আগে আসে। সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু ছেলে অথবা মেয়েতে পরিণত হয়, যা ভবিষ্যৎ পুরুষ ও নারীতে রূপান্তরকে সূচিত করে, দেখা যায় যৌন দ্বি-রূপতা (Sexual diamorphism)।

4) প্রাপ্ত বয়স্ক (Adulthood) : কৈশোরের পারে আসে পূর্ণপ্রাপ্তির সময়। দৈহিক উচ্চতা সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির বিরতি প্রাপ্ত বয়স্কের বিশেষ লক্ষণ। সাধারণত পুরুষরা 21 বছর বয়সে এবং নারীরা 18 বছর বয়সে সম্পূর্ণ উচ্চতা লাভ করে। তবে প্রাপ্ত বয়স্কের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য প্রজনন ক্ষমতার বিকাশের জন্য পুরুষ ও নারীকে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়।

৫.৬.৪ শিশুর জীবনবিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা :

শিশুর জৈবিক সত্তা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, শিশু বাবার বৈশিষ্ট্য গঠনকারী জিনগুলি লাভ করে শুক্রাণুর মাধ্যমে এবং মায়ের বৈশিষ্ট্য গঠনকারী জিনগুলি লাভ করে মায়ের ডিম্বাণুর মাধ্যমে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকে বিশেষ বিশেষ ধরণের জিনোটাইপ (Genotype) এই জিনোটাইপ অনুসারে শিশুর বিকাশ ঘটে থাকে। বংশগতির ধারায় মানবশিশু যে বিশেষ বিশেষ জিনোটাইপ লাভ করে সেই অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যগুলি সূচিত হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে কোন জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের দেহাংশগুলির অনুপাত বৃদ্ধির হার ইত্যাদি বিষয়ে সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতা-মাতাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকেই অনুসরণ করে চলে।

কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির শারীরিক ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির নিয়ন্ত্রণেণ জীনগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে নিয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু পরিবেশের প্রভাব কতখানি? এব্যাপারে বলা যেতে পারে পরিবেশ প্রভাবকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। বরং বলা চলে যে কোন ব্যক্তির যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণে বংশগতি এবং পরিবশের এবং সময়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। যে কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক গঠনে বংশগত বন্ধু এবং পরিবেশ উভয়েরই প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ও। এদের কোন একটিকে অপরটি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ একথা বলা ঠিক হবে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে মানুষের নিষিক্ত ডিম্বাণুর ভিতর জীনবহনকারী ক্রোমোজোম না থাকলে সেটির বিকাশ যেমন সম্ভব হত না, তেমনই মাতৃগভের পরিবেশ থেকে সেটিকে অপসারিত করলে যথাযথ পুষ্টি, উত্তাপ ইত্যাদি অভাবেও তার বিকাশ সম্ভব হত না। প্রকৃত পক্ষে জীনের কার্যক্রম পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। দেহাভ্যন্তরে এই পরিবেশ বলতে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সাইটোপ্লাজম ও ঐ কোষের অবস্থান ইত্যাদিকে বোঝায়। আবার জীনের কার্যক্রম প্রসঙ্গে আর একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন জীনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষমতা (পেনিট্র্যান্স) এবং প্রকাশের মাত্রার (এক্সপ্রেসিভিটি) উপর জীন নিয়ন্ত্রিত ঐ নির্দিষ্ট চরিত্রটি কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেবে কিনা নির্ভর করে। জীনের এই দুটি ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও পরিবেশ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ব্যক্তিত্ব বংশগতি ও পরিবেশের উভয়েরই মিলিত প্রভাবে গড়ে ওঠে। ম্যাকাইভার ও পেজ-এর বক্তব্য দিয়ে এই প্রসঙ্গে উপসংহার টানার চেষ্টা করবো। ম্যাকাইভার ও পেজ-এর বক্তব্য হল, "All the qualities of life are in the heredity, all the evocation of qualities depends on the environment." অর্থাৎ জীবনের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি নিহিত থাকে বংশগতির মধ্যে আর এই বৈশিষ্ট্যগুলির সর্বপ্রকার বিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর।

৫.৬.৫ শিশুর জৈবিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা (Role of environment on biological development of child) :

মানব শিশুর বিকাশের ধারাকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, একটি হল জৈবিক বিকাশ এবং অন্যটি হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ। শিশুর জৈবিক বিকাশে পরিবেশের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

১) মায়ের স্বাস্থ্য, গর্ভস্থ পরিবেশ ও রক্তের প্রকৃতি

২) খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ

৩) শিশুর বয়সের পর্যায়
৪) শিশুর হরমোণতন্ত্র
৫) ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উৎস
নিম্নে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) মায়ের গর্ভস্থপরিবেশে, স্বাস্থ্য ও রক্তের প্রকৃতি :

মানবশিশুকে ভ্রূণ অবস্থা থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থান করতে হয়। এই অবস্থানের সময়কাল প্রায় ২৮৭ দিন। এই সময়কালে শিশুর ক্রমবিকাশের পরিবেশ হল মাতৃগর্ভ এবং তার সামগ্রিক স্বাস্থ্য। প্রকৃত পক্ষে মানবশিশুর পরিবেশের সূচনা হয় তার জোইগোট অবস্থায় মাতৃগর্ভে আবির্ভাবকাল থেকে। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে মানব শিশু বেশীরভাগ সময় যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি নিয়ে জন্মায় তার বেশীরভাগই মাতৃগর্ভের পরিবেশ দূষণজনিত। মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (দু সপ্তাহ পর) ভ্রূণটি জরায়ু সংলগ্ন একটি থলির মধ্যে থাকে। থলিটি একটি জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে, একে বলা হয় অ্যামনিয়টিক জলীয় পদার্থ (amuistic fluid)। এই জলীয় পদার্থের গঠন দূষণমুক্ত থাকা জরুরী।

মানবশিশুর আদি পরিবেশ এই মাতৃগর্ভের পরিবেশেও অনেকা সময় কোন কোন ভাইরাস ফুল বা প্লাসেন্টার মধ্য দিয়ে ভ্রূণকে সংক্রামিত করতে পারে। তাছাড়া, এই সময় মায়ের অসুস্থতা, মায়ের হাঁটা চলা ফেরা ও মানসিক অবস্থা প্রতিকূল হলে তা গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি সাধন করতে পারে।

মাতৃগর্ভস্থ শিশুর পরিবেশ আরো একটি কারণে দূষিত হয়, তাহল মায়ের নেশাগ্রস্ত হওয়া। গর্ভবর্তী নারী যদি ধূমপান বা অন্যকোন মাদক দ্রব্যে আসক্ত হন, তাহলে অনেকক্ষেত্রেই তাঁর সন্তান পরিণত হওয়ার আগেই ভূমিষ্ঠ হয় (pre-mature delivery)। এই ধরনের ঘটনায় শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মানব শিশুর বিকাশের পথে আর একটি অন্তরায় হল গর্ভবর্তী মায়ের শরীর তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা বা ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হলে গর্ভবর্তী মায়ের রক্তের মধ্যে যে Rh ফ্যাক্টর থাকে, তার সাথে শিশুর রক্তের Rh এর অসংগতির ফলে জন্মের আগেই সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

২) খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ :

প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই শিশু তার জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উপযোগী সমস্ত উপকরণগুলি লাভ করে। শিশুর পুষ্টি ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন তা সে পায় উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল থেকে। সংগৃহীত খাদ্যের মাধ্যমেই শিশু তার সমস্ত জৈবিক সক্রিয়তা বজায় রাখতে পারে। অপুষ্টি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। যে সব ছেলেমেয়ে দারিদ্র্যের কারণে ক্ষুধাপীড়িত থাকে তাদের দৈহিক বৃদ্ধি প্রাথমিক অবস্থা থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদের অস্থি কাঠামোও সুগঠিত হয় না।

৩) শিশুর বয়সের পর্যায় :

শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দেহে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। কোনো কোনো জিনোটাইপের উপস্থিতি কেবল নির্দিষ্ট বয়সের পরেই ফিনোটাইপে প্রকাশিত হয়। মানুষে রক্তের শ্রেণির অ্যান্টিজেনের নিয়ন্ত্রক জীনের প্রভাব জন্মের আগে থেকেই নির্ধারিত হয়। আবার মানুষের বিভিন্ন

রোগ যেমন অ্যালক্যাপটোবিউরিয়া রোগের জীনের প্রকাশ হয় জন্মের পরে। ভিটামিন-D প্রতিরোধক রোগের প্রকাশ হয় এক বছর বয়সে। Juvenile amaurotic idiocy রোগ 5-10 বছর বয়সে হয়। নির্দিষ্ট প্যাটার্নের মাথার ঢাকের প্রকাশ হয় 20-30 বছরের মধ্যে। ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয় 40-60 বছর বয়সের মধ্যে।

৪) শিশুর হরমোন তন্ত্র :

মানব শিশুর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর একটি দরকারী বিষয় হল হরমোনের প্রভাব। হরমোন গ্রন্থি (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি) নামে এক বিশেষ ধরনের দেহকলা থেকে হরমোন নামে এই জৈব রাসায়নিক বস্তুটি নিঃসৃত হয়। মানবদেহে বৃদ্ধির জন্য তিনটি হরমোন বিশেষভাবে কার্যকরী। এগুলি হল থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত থাইরক্সিন হরমোন, পিটুইটারী নিঃসৃত STH বা সোমাটোট্রাফিক হরমোন, GTH বা গোনাডোট্রাফিক হরমোন। অ্যাড্রিনালিন হরমোনটিও বিশেষভাবে কার্যকরী। এই সমস্ত হরমোনগুলির গভীরতর এবং জটীল কার্যকলাপের ফলেই কৈশোরকালীন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত ও পরিচালিত হয়।

৫) ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উৎস :

জাতিগত বৈসাদৃশ্যও মানবশিশুর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক উৎসের বিচারে বিশ্লেষণের দ্বারা জাতি সমূহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ধারা নির্ণিত হয়। এই বিশেষ ধারাও বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিবদ্ধ। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে এই কারণে দৈহিক উচ্চতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন মাত্রার জলবায়ু ও সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবশিশুর বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে উচ্চ অক্ষাংশে বসবাসকারী অধিবাসীদের বক্ষদেশের পরিধি এবং ফুসফুসের আকার সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী অধিবাসীদের অপেক্ষা বড় হয়।

পরিবেশের এই উপাদানগুলির মানবশিশুর বৃদ্ধিতে যে প্রভাব আমরা দেখলাম, তাতে বলা যে, সুস্থ ও স্বাভাবিক দূষণমুক্ত পরিবেশ যেমন মানবশিশুর বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করে ঠিক তেমনি অস্বাস্থ্যকর, অস্বাভাবিক ও দূষণযুক্ত পরিবেশ, দূষিত ও ভেজাল খাদ্যবস্তু শিশুর বৃদ্ধিকে মন্দীভূত করে দেয়। রোগ, ভগ্নস্বাস্থ্য, শারীরস্থানিক বিশৃঙ্খলতা (physiological disorder) শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধা দেয়।

৫.৬.৬ শিশুর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা (Role of environment on social and cultural development of child) :

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় তার নিজস্ব ভাবধারা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা এবং আচার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ নিজস্ব রূপ লাভ করে। কোনো একটি বিশেস সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ সেই সমাজের সামাজিক অনুশাসনগুলি মেনে চলেন এবং চলতে বাধ্য হন। নিজের নিজের সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলেন। এইভাবে সামাজিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিই হল সামাজিকীকরণ। এটিই সমাজ জীবনের ভিত্তি, সমাজবদ্ধ মানুষের সন্তান-সন্ততিরা সেই ধারাকেই বহন করে নিয়ে চলে আর রচনা করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে কীভাবে এই সামাজিকীকরণের

ঘটনা ঘটে? পরিবেশ কীভাবে এই বিষয়ে ভূমিকা পালন করে? এখানে আমরা মানবশিশুর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো।

শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশ্বপ্রকৃতি এবং সমাজ উভয় পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক বিকাশে বিশ্বপ্রকৃতির ভূমিকা নিম্নরূপ—

১) জ্ঞানার্জন : মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই হল জ্ঞানলাভের হাতিয়ার। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থানকালে মানবশিশু একদিকে যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথ ব্যবহার করে ক্রিয়াশীল বা কার্যকরী গড়ে তোলার সুযোগ পায়, তেমনি অন্যদিকে প্রকৃতির সামগ্রী থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে যা তার সমাজ সংস্কৃতিতে কাজে লাগাতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ধারণা শিশু প্রকৃতি থেকেই লাভ করতে পারে। প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে শিশু নিজেকে এবং সমাজকে উপলব্ধি করতে শেখে।

২) শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ : প্রকৃতির রাজ্যে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে। ঋতু পরিবর্তনের বিষয়, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও ক্রিয়াপ্রণালী সবই নিয়মের অধীন। প্রকৃতির এই নিয়মানুবর্তিতা শিশুর জীবনে শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ ঘটায়।

৩) সৌন্দর্যবোধের বিকাশ : প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবশিশুর সামনে সব সময় তার সামঞ্জস্য রূপ তুলে ধরে। বৃক্ষের শাখায় শাখায় পত্রবিন্যাস, ফুলের দলমণ্ডলের সজ্জারীতি, বর্ণবৈচিত্র্য, বর্ণবিন্যাস শিশুমনে এক সামঞ্জস্যের ধারণা গড়ে তোলে। আবার পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, ঝরণা, নদী কিংবা সমুদ্রের অবস্থান শিশুর সামগ্রিক চেতনায় এক নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। স্বাভাবিকভাবেই মানবশিশুর সৌন্দর্যবোধের বিকাশে প্রকৃতির মহামূল্যবান ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এই সৌন্দর্যবোধই শিশুকে করে তোলে কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী প্রভৃতি।

৪) আবেগমূলক বিকাশ : প্রতিটি মানুষই প্রকৃতিতে স্বাধীন। মানুষের স্বতস্ফূর্ত চিন্তা চেতনার মুক্তি ঘটে, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমস্ত অনুভূতিকে সে লাভ করে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটেই। আবার এই আবেগ বা প্রক্ষোভগুলিকে উপলব্ধির সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই।

৫) সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ : প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত জীবজগৎ এর মধ্যেও আছে সমাজবদ্ধতা। দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে এরাও দেখায় অকত্য স্নেহ, সমবেদনা, সহযোগিতার মনোভাব, প্রতিদ্বন্দ্বীতার মানসিকতা প্রভৃতি। প্রকৃতির রাজ্যেএই পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানবশিশু প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকরণ করে থাকে। এমনকি প্রকৃতির মধ্যেই স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রযুক্তি, মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায় যা বিস্ময়কর। প্রকৃতির এই প্রাণচাঞ্চল্য সজীবতায় সিক্ত প্রযুক্তির বিকাশও শিশুকে আকৃষ্ট করে, যা পরবর্তীকালে তার উন্নত চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করে।

সুতরাং মানবশিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনবিকাশের প্রাথমিক দায়িত্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকখানি গ্রহণ করে থাকে। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হল মানবশিশুকে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে তোলা, সেক্ষেত্রে বলা যায় বিশ্বপ্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশুর জীবনে স্বাভাবিক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

শিশুর-সামাজিক বিকাশে সমাজ এক বিশাল দায়িত্ব পালন করে থাকে। মানুষেণ সমাজগঠনের তাগিদ আর সমাজের মানুষকে সামাজিক করে তোলার তাগিদ যেন একে অন্যের পরিপূরক। আমরা এখানে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সমাজের ভূমিকা (Role of Society) :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু এই 'সমাজ' বলতে কী বোঝায়। 'সমাজ' কথাটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক 'সমাজের' বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাকাইভার (MacIver) সমাজের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে— "Society is a system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties." অর্থাৎ, "সমাজ হচ্ছে বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতির, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার বহু সংখ্যক গোষ্ঠী ও শ্রেণিবিভক্তির মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের একটি সমগ্র ব্যবস্থা"। ম্যাকাইভার সামাজিক সম্পর্কের পুরো ব্যবস্থাটিকেই বলেছেন সমাজ। ম্যাকাইভার সি. এইচ কুলী C.H. Cooley)-এর মতো সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজকে আবার একটি প্রক্রিয়া হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। ম্যাকাইভারের মতে, সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের জাল (ever-changing web of social relationships)। মানুষে মানুষে অবিরাম বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্তঃক্রিয়া চলতেই থাকে। এই আন্তঃক্রিয়ার পরিণতিতে ঘটে সামাজিকীকরণ। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির সারা জীবনব্যাপী বর্তথমান থাকে। সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি গোষ্ঠীজীবনের রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলি আয়ত্ত করে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়াশীল কতকগুলি উপাদান হল— অনুকরণ (imitation), অভিভাবন (suggestion), অঙ্গীভূত করণ (identification) এবং ভাষাশিক্ষা (language learning)। এই সমস্ত উপাদানগুলির দ্বারা শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়ে যায় জন্মলাভের পর থেকেই। শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল— পরিবার, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী, বিদ্যায়তন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, রাষ্ট্র ইত্যাদি। সংক্ষেপে এদের আলোচনা করা হল।

১। পরিবার (family) :

পরিবারে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন— "The family is group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of the children." অর্থাৎ "পরিবার হল যৌন সম্পর্ক দ্বারা সংজ্ঞায়িত এমন একটি গোষ্ঠী যা সন্তানসমূহের প্রজনন ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী।"

পরিবারের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেগুলি হল :

(i) পরিবার একটি স্থায়ী এবং সর্বজনীন সংস্থা।
(ii) পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ এবং রক্ত সম্পর্কের আবেগপূর্ণ বন্ধন থাকে।
(iii) পরিবারের একটি সাধারণ বাসস্থান থাকে।
(iv) পরিবার একটি অর্থনৈতিক এবং সহযোগিতামূলক সংস্থা।
(v) পরিবারের সদস্যরা পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে স্বীকৃত।
(vi) পরিবারই হল শিশুর জন্মস্থান এবং প্রথম সামাজিক পরিবেশ।
(vii) পরিবারের গঠন প্রকৃতি সতত পরিবর্তনশীল। মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ পরিবারের আয়তনকে পরিবর্তিত করে।
(viii) পরিবারের ধারা অনুসারে শিশুদের মানসিক গঠনে পরিবার দায়বদ্ধ।

শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিবারের কার্যাবলী :

১) শিশুর জন্ম ও পরিচর্যা : মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে কোনো একটি বিশেষ পরিবারে। বাবা-মা সেই পরিবারের সদস্য। শিশু জন্মকালে থাকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়। সেই সময় বেশ কিছুদিন তাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দেখাশোনা বা পরিচর্যা করতে হয়। পরিবারের প্রধান কাজ হল শিশুর সেই পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

২) শিশুর মানসিক গঠনের ব্যবস্থা : পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসার বন্ধন বিশেষভাবে পরিস্ফুট। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের ভালবাসার সম্পর্ক, পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রতিশ্রুতি, বিভিন্ন অবস্থায় সুখ-দুঃখের সমবণ্টনের নীতি শিশুর মনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

৩) শিশুকে সামাজিক মর্যাদা দান : সামাজিক ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিচিতি ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর সমাজজীবনে পারিবারিক পরিচিতির নিরিখে ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুর মর্যাদা রক্ষায় পরিবার এইভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সুনামের পর্যায় অনুসারে তার সদস্যদের (শিশুরও) সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে।

৪) শিশুর সামাজিকীকরণ : মানবশিশুর সামাজিকীকরণের সূচনা ঘটে পরিবারের মধ্যেই। জন্মের পর শিশুকে সমাজ-জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য পরিবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করে। পরিবারে মধ্যে থেকেই শিশু শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিক আদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ রপ্ত করে। পরিবারের মধ্যে অবস্থানের দ্বারা শিশুর মধ্যে 'আমরা বোধ' (we feeling) জাগ্রত হয়। পরিবার পরবর্তী প্রজন্ম 'শিশুর' হাতে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তুলে দেয়।

৫) শিশুর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠন : প্রতিটি পরিবার সমাজের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং এতে অংশগ্রহণে প্রত্যেককেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে। পিতা-মাতা ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকে শিশু ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়। পারিবারিক ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মবোধ শিশুর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ধর্মীয়ক্ষেত্রেও উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে পরিবার সহায়তা করে থাকে।

৬) শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বপালন : শিশুর প্রারম্ভিক বিষয় হল ভাষাশিক্ষা। মানবশিশুর ভাষা বিকাশ ঘটে পরিবারের মধ্যেই। শিশুর ভাষাজ্ঞান, শব্দভাণ্ডার, বাক্যবিন্যাস, প্রকাশভঙ্গি সবই নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের সাংস্কৃতিক পরিচয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণগত মান অনুসারে। আবার প্রথাগত শিক্ষার প্রস্তুতিতে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পূর্ব শর্ত হিসাবে কিছু প্রাসঙ্গিক শিক্ষা আচরণ ও অভিজ্ঞতা প্রদান করে এই পরিবার। পরবর্তীকালে প্রথাগত শিক্ষায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণেও পরিবার বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২। বিদ্যালয় (School) :

শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে দায়িত্ব পালনে পরিবারের মত বিদ্যালয় যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পালন করে। আধুনিককালে পরিবার থেকে আলাদ হয়ে ভিন্ন ধারায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যালয়গুলি সমাজে অধিষ্ঠান করে থাকে। সাধারণভাবে বিদ্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত যে আলয় বা গৃহ তাই হল বিদ্যালয়। সেই অর্থে যে কোন বয়সের মানুষের জন্য শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন— প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়,

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন— (i) নিজস্ব অবস্থান ও বাড়ি, (ii) একদল শিক্ষার্থী, (iii) নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, (iv) নির্দিষ্ট শিক্ষক, (v) প্রয়োজনীয় কতকগুলি আসবাব পত্র ও সরঞ্জাম, (vi) নির্দিষ্ট পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা :

১) শিশুর জ্ঞানমূলক বিকাশ : বিদ্যালয় প্রবেশের পূর্বে শিশু অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রকৃতি এবং পরিবার ও সমাজের অন্যান ক্ষেত্র থেকে যে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করে থাকে তা-ই তার যথেষ্ট নয়। তার সাংস্কৃতিক দিকের উন্নয়নের জন্য অবশ্য জ্ঞানভাণ্ডারকে বৃদ্ধি করতে হয়। শিশুর এই জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় বিশেষ দায়িত্বপালন করে থাকে। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময় অনুসারে নির্দিষ্ট বিষয়সূচি মেনে শিক্ষক যে পাঠক্রম করেন, তার একটা বড় অংশে থাকে তথ্যভাণ্ডার। এই তথ্যভাণ্ডার ও জ্ঞানভাণ্ডারকে শিশু আপন বুদ্ধিমত্তায় গ্রহণ করে তার সাংস্কৃতিক জগতের বিস্তার ঘটায়।

২) শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন : শিশু শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যাতে বিপথে চালিত না হয়, যাতে তাদের মধ্যে বুদ্ধি সৃজনশীলতা, জ্ঞানবোধ, যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়। শিশু শিক্ষার্থীদের বয়স, ক্ষমতা, মনের প্রকৃতি, আগ্রহ, রুচি অনুসারে জ্ঞান-বোধ-দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করা বিদ্যালয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩) সামাজিক বোধের উন্মেষ : বিদ্যালয়ের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন থাকে। শিশু শিক্ষার্থীদের এই সব নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করতে গিয়েই তাদের আরো কতকগুলি সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে, যেমন— সহযোগিতা, সমবেদনা, পারস্পরিক মমত্ববোধ ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণগুলির ভিত্তিতেই তার মধ্যে গড়ে সামাজিক বোধ বা সামাজিকীকরণের বোধ।

৪) গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ : শিশু শিক্ষার্থীরা যাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে তার ব্যবস্থাও করে বিদ্যালয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে শিশুকে উন্নত ধরনের জ্ঞান, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত ধারণা। মানবিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সংক্রান্ত ধারণাও থাকা দরকার। বিদ্যালয় এই দায়িত্ব যথেষ্ট্য দক্ষতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করে।

৫) অতীত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও নূনতজ্ঞানের পুনঃসৃজন : বিদ্যালয়-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অতীত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ। মানুষ বংশ পরম্পরায় যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেগুলিকে মানুষের জীবনের ক্রমোন্নতিতে কাজে লাগানোর জন্য পরবর্তী প্রজন্মের শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রন্থাগারের মধ্যে, সামগ্রিক কার্যধারায় কোন অংশে সংরক্ষিত করে রাখার দায়িত্ব পালন করে বিদ্যালয়। আবার এই বিদ্যালয় বিশেষ মানবগোষ্ঠীর অতীত ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, ভাবধারা, সংস্কার, রীতিনীতি বিশ্বাসকে পরবর্তী প্রজন্মের শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালন ঘটায়। ফলে ঐতিহ্যের ধারাটি প্রবহমান থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র অতীত ঐতিহ্যই বর্তমান জীবনের অগ্রগতিকে বজায় রাখতে পারে না, তাই প্রয়োজন হয় নূতন জ্ঞানের উন্মেষ, নূতন অভিজ্ঞতার জন্ম বা পুনঃসৃজন। অভিজ্ঞতার নূতন নূতন উন্মেষ বা পুনঃসৃজনের মাধ্যমে মানব সমাজের প্রগতির সাধন সম্ভব হয়। বিদ্যালয় এই কাজটিও করে শিশু শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই।

৩। অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী :

সমবয়সীদের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীও শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমবয়সীদের শিশুর সম্পর্ক হল সখ্যতার সম্পর্ক। এই ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে

অনেক কিছু আয়ত্ত করে। শৈশবে ও কৈশোরে মানুষ অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর কাছ থেকে এমন অনেক বিষয় জানতে পারে যা পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আয়ত্ত করতে পারে না, আয়ত্ত করা ততটা সম্ভব নয়। আধুনিক জীবনের অনেক ফ্যাশন, আদব কায়দা, কিংবা আধুনিক প্রযুক্তিমূলক দ্রব্যসামগ্রী একমাত্র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর কাছ থেকে শেখা যায় বা জানা যায়। সুস্থ সমাজ জীবনের স্বার্থে শিশুর এই সমস্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বিনোদনের জন্য সময় কাটানোর প্রসঙ্গেও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। খেলার মাঠে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীই সমাজচেতনা ও 'আমরা-বোধ' গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান :

'ধর্ম' কি? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক এমিল ডুর্কহেউমের মতানুসারে ধর্ম হল পবিত্র বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিশ্বাস ও সুসংবদ্ধ আচরণ প্রণালী। যা কিছু পার্থিব, অলঙ্ঘনীয় ও উচ্চস্তরের তাই পবিত্র বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়। পবিত্র বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও আচরণের অনুগামী মানুষ সংযুক্তভাবে একটি সুসংবদ্ধ নৈতিক জনগোষ্ঠী গঠন করে। চার্চ হল এই রকম একটি জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠানিক রূপ। চার্চ-এর মত অনুরূপ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাদেরকে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

মানবশিশুর সামাজিক জীবনে ধর্মের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে

(i) ব্যক্তি মানুষের আচর-ব্যবহার এবং সমাজ জীবনের ধারা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম মানুষকে সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে সাহায্য করে।

(ii) সমাজ জীবনে অনেক সময় মানুষ বহুবিধ যন্ত্রনার মধ্যে পড়ে। ধর্মবোধ তখন মানুষকে যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে হতাশার সমাপ্তি ঘটায়।

(iii) ধর্মই অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চরিত্র গঠন করে এবং এই সূত্রে কার্যকরভাবে সমাজ জীবনকেও প্রভাবিত করে।

(iv) প্রত্যেক সমাজে সামাজিক সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে যে সকল ভাবানুভূতি অন্যকথায় যে সকল আদর্শ, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি কার্যকর থাকে, ধর্ম সেগুলির অন্যতম সঞ্চারক ও সংরক্ষক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

(v) ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধে তুলে তাকে পরার্থমূলক কাজে প্রবৃত্ত করে। সমষ্টিগত জীবনযাপনে নতুন ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের প্রবর্তন করে।

(vi) সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পশ্চাতেও অনেক সময় ধর্মের পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রূপ কাজ করে।

(vii) জনসমাজে শিক্ষার প্রচার এবং সমাজ সেবামূলক ও মানব হিতকর কার্যাবলীতেও ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৩ (Check your progress-3)

নির্দেশ : ..... একই বিষয় হবে .....

ক) শিশুর সৌন্দর্যবোধের বিকাশের প্রয়োজন কেন?

খ) শিশুকেও কেন মর্যাদা দান করা প্রয়োজন?

গ) শিশুর বিদ্যালয়ের দুইটি ভূমিকা লেখ।

৫.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

এই অধ্যায়ে শিশু ও তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ বলতে বোঝানো হয়েছে যে উদ্দীপক যুক্ত পরিস্থিতি যার প্রভাবে শিশুর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটায়। পরিবেশের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে পরিবেশকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপাদানগুলির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

পরিবেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিবেশগত অনুভূতি বা পরিবেশগত বেদন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রূপ, সিদ্ধান্ত ও কর্ম প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে তার পরিবেশগত বেদন।

পরিবেশগত বেদনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় হল তার শৈশব। আর এই শৈশবের পরিবেশ শিশুর সমস্ত জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ পরিবেশ শব্দটির অর্থ ব্যাপক; কাজেই জৈবিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ শিশুর ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে যুক্ত শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশের বিভিন্ন দিক। তবে শিশুর জীবনের বিকাশ ও বৃদ্ধিতে বংশগতির প্রভাবও কম নয়।

৫.৮ অনুশীলনী (Exercise)

ক) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রতিটি ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) পরিবেশ কাকে বলে?

(ii) গ্রামীন পরিবেশ কি?

(iii) পরিবেশগত বেদনের পর্যায়গুলি কি কি?

(iv) শিশুর জীবন বিকাশের স্তরগুলি কি কি?

খ) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রতিটি ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) মানুষ্য ও পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধ কি?

(ii) নবনিয়ন্ত্রণবাদ বলতে কি বোঝেন?

(iii) শিশুকে কি ভাবে পুষ্টি সরবরাহ করা উচিত?

গ) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রতিটি ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) শিশুর জৈবিক ধারণার ব্যাখ্যা দিন।

(ii) শিশুর সাংস্কৃতিক বিকাশ বলতে কি বোঝেন?

(iii) শিশুর জীবন বিকাশে বংশগতির ভূমিকা কি?

(iv) শিশুর জীবনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা কি?

৫.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত (Hints of answer to check your progress)

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-১

(ক) আমাদের পরিধির ভেতর যা আমাদের প্রভাবিত করে।

(খ) পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

(গ) সক্রিয়তা এবং ব্যপকতা

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-২

ক) পাঁচ প্রকার, খ) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান গুলি হল জড়, সজীব উপাদান মানুষ ইত্যাদি। গ) মানুষের কর্ম প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম নিয়ন্ত্রক না হলেও তার প্রভাব মানব জীবনে প্রভাব ফেলে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৩

ক) সৌন্দর্যবোধের বিকাশ শিশুর ভবিষ্যত জীবনে তাকে কবি, শিল্পী, সাহিত্য করে তোলে। খ) সামাজিক পরিমণ্ডলে শিশুর মর্যাদা পাওয়া দরকার। কারণ এর উপর শিশুর বিকাশ অনেক অংশে নির্ভরশীল। গ) জ্ঞানমূলক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠন।

একক ৬ ❑ শিশুর পরিবেশ (Child's Environment)

গঠন **(Structure)**

৬.১ ভূমিকা **(Introduction)**

৬.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৬.৩ শিশুর পিতা-মাতার দায়িত্ব **(Responsibility of parents)**

৬.৩.১ শিশুর শারীরিক বিকাশ ও যত্ন-পরিচর্যা **(Physical growth, care and protection of child)**

৬.৩.২ শিশুর মন, আবেগ ও সমাজ সত্তার বিকাশে বাবা-মায়ের দায়িত্ব **(Parental responsibilities for the development of mind, emotion and social self of child)**

৬.৪ শিশুর জীবন বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব **(Responsibilities of teachers for the growth and development of child)**

৬.৫ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

৬.৬ অনুশীলনী **(Exercise)**

৬.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints of answer to check your progress)**

৬.১ ভূমিকা (Introduction)

একটি পরিবারে যে কোন নব দম্পতির প্রত্যাশার বাতাবরণ তৈরি হয় করে একটি নতুন শিশুর আবির্ভাব ঘটবে। মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের প্রথম কিংবা পরবর্তী স্বাদ গ্রহণের অপেক্ষায় থাকেন। যে নতুন অতিথি পরিবারে আসে তার জন্য সারা পরিবার তৈরি হতে থাকে একটা আলাদা পরিবেশ। তারপর নবজাতককে ঘিরে প্রতিটি দম্পতিই সন্তান পালনের ক্ষেত্রে কতকগুলি সহজাত ধারণা, পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা, সমাজ স্বীকৃত কিছু রীতিনীতিকে ভিত্তি করে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর উদ্দেশ্য হল শিশু সন্তানের দৈহিক, মানসিক, আবেগমূলক চাহিদা পূরণ, নিরাপত্তা প্রদান এবং তার সামগ্রিক জীবনবিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। বাবা-মায়ের সেই দায়িত্বের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরির জন্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি শেষ করার পর আপনি—

- শিশুর জীবনের পিতা-মাতার বিভিন্ন দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে, বুঝতে ও প্রয়োগ করতে পারবেন;
- শিশুর জীবন বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকার বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে পারবে এবং প্রয়োগ করতে পারবে।

৬.৩ শিশুর বাবা-মায়ের দায়িত্ব

বাবা-মায়ের দায়িত্বগুলিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) শিশুর শারীরিক বিকাশ ও যত্ন পরিচর্যা এবং

(ii) শিশুর মানসিক, প্রাক্ষেভিক ও সামাজিক বিকাশ

৬.৩.১ শিশুর শারীরিক বিকাশ ও যত্ন-পরিচর্যা (Physical growth, care and protection of child) :

ক) গর্ভধারণকারী ভাবী মায়ের দায়িত্ব

১) মানবশিশুর আদি পরিবেশ হল মাতৃগর্ভ। এই মাতৃগর্ভকে সব দিক থেকে সুরক্ষিত রাখা মায়ের দায়িত্ব। মা যাতে নিজে কোনো ভাবেই কোনো বড় অসুখে না পড়েন, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে নিজেকে সাবধানে রাখা দরকার। অসুস্থ হয়ে পড়লে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণকরা উচিত। সংক্রমক রোগ থেকে তিনি যেমন সাবধান থাকবেন তেমনি কোনরকম আঘাত যেন না পান সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২) গর্ভবতী মায়ের ওঠাবসা, হাটাচলা ফেরার ত্রুটির জন্য কিংবা কোনরকম অস্বাভবিক অবস্থায় বসে বা শুয়ে থাকার কারণে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে সেই ব্যাপারে মা'কে সাবধানে থাকতে হবে।

৩) ভাবী মায়ের কোনভাবেই নেশা বা কোন মাদকদ্রব্য সেবন-এ আসক্তি থাকা উচিত হবে না।

৪) মায়ের পুষ্টিতে শিশু/ভ্রূণের পুষ্টি লাভ। তাই মায়ের পুষ্টির জন্য মা'কে সদা সর্বদা সতর্ক থাকবে হবে। অপুষ্টি জনিত অবস্থায় যে মা ভোগেন তার গর্ভস্থ পরিবেশ শিশুর পক্ষে যথার্থ অনুকূল অবস্থা নয়।

৫) মায়ের কোনভাবেই মারাত্মক উদ্বেগ থাকা ঠিক নয়। ভয়, মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, উত্তেজনা, ঈর্শা, অস্বাভাবিক চিন্তা মানব ভ্রূণের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারে।

খ) সদ্যজাত শিশুর পরিচর্যা :

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই নবজাতক হাই তোলা, হিক্কা তোলা, ভ্রূ কোঁচকানো, মাথাকে সামান্য তোলা বা নাড়ানোর কাজ করতে পারে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা শিশু তার শ্বাস প্রক্রিয়াকে ক্রমশ সহজ করে তোলার চেষ্টা করে। আলোক সংবেদনে সে সাড়াও দেয়। তার চোষার ক্ষমতা, গেলার ক্ষমতা ও খাওয়ার জন্য মুখ নাড়ার ক্ষমতাও থাকে। এগুলি স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে কি না তা

নবজাতকের মা-কে ভীষণভাবে খেয়াল রাখতে হবে। কোন রকম অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি অথবা চিকিৎসকের গোচরে আনতে হবে। প্রি-ম্যাচিয়োর বোধ জন্ম গ্রহণ করলে মায়ের সচেতনতা ও দায়িত্ব এই ব্যাপারে কিছুটা বেড়ে যায়। সদ্যজাত শিশুর প্রতি এই পরিচর্যা চলে সাধারণ দু'সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত।

গ) টীকাকরণের কাজ :

যেহেতু শিশু জন্মাবার প্রথম বছর থেকেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি এবং আক্রান্ত হলে তার পক্ষে প্রতিরোধ করাও বেশ কঠিন ও প্রায় দুঃসাধ্য তাই ঐ সমস্ত রোগের হাত থেকে শিশুকে বাঁচাবার জন্য আগেভাগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত ভাবে টীকাকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এজন্য বাবা-মা'কে অবশ্যই সচেতন হয়ে শিশুকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা নেবেন। ছয়টি রোগ যেমন ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার (tetanus), হুপিং কাশি, পোলিও মায়েলাইটিস, যক্ষ্মা (tuberculosis) এবং হাম (measles) এর রোগ প্রতিষেধক হিসাবে প্রয়োজনীয় টীকা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়াও বর্তমানে সচেতন বাবা-মা শিশুকে আরো একটু সুরক্ষিত রাখার জন্য মাম্পস, রুবেলা, জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জণ্ডিস প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক শিশুকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। শিশুর এই টীকাকরণের জন্য নিয়মিতভবে চিকিৎসকের কাছে যেমন পরামর্শ নেওয়া হয় তেমনি এই কাজ বলে শিশুর পনের বছর বয়স পর্যন্ত।

ঘ) শিশুর খাওয়া-দাওয়া :

জন্মগ্রহণের পর শিশু স্বাভাবিক শারীরিক প্রয়োজনেই খেতে শেখে। এই খাওয়াতেই তার সুখ, তার আরাম আর শারীরিক ও মানসিক শান্তি। শিশুকে এই খাওয়ানোর কাজে কখনো ধরা বাঁধা সময় সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন করা উচিত নয়, প্রয়োজনও নেই। শিশুর কান্না ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মা-কে অনুভব করতে হবে শিশুকে খাওয়ার কথা। এইসময় শিশু স্বাভাবিকভাবেই স্তনদুগ্ধ খায়। খাওয়ানোর সময় শিশুর সাথে কথা বলা, আদর করা দরকার, কিন্তু কোনরকম তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। শৈশবের প্রথম পর্বে এক বছর বয়সের মধ্যে শিশুর খাদ্যের প্রয়োজন না হলে, সে আপনা থেকে জোর করে খাওয়ানো খাদ্যকে বা অপ্রয়োজনীয় খাদ্যকে বমি করে দেয়। বেঁচে থাকার জন্যই শিশুর এই ক্ষমতাটি হল স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিদত্ত। আধুনিককালে একটা প্রবণতা বিশেষ করে আধা-শহর ও শহরাঞ্চলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত দেখা যায় মায়েরা তাড়াতাড়ি বুকের দুধ ছাড়াবার জন্য প্রস্তুতি নেয়। এই ধরনের প্রবনতা শিশুটির পক্ষে ক্ষতিকারক। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা WHO এর এক অনুসন্ধানের ফলাফলে দেখা গেছে যে, কৃত্রিম দুধ অপেক্ষা মাতৃদুগ্ধই শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি উপকারী। মায়ের বুকের সাথে কোলাস্ট্রোল নামে যে পদার্থটি থাকে তা শিশুর রোগ প্রতিরোধের সহায়ক।

শিশু যখন আরো একটু বড় হয় তখন তার খাদ্য তালিকায় আরো কিছু জিনিস যুক্ত হয়, ফলে খাওয়াকে কেন্দ্র করে শিশুর কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয়। খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ, ঠাণ্ড-গরম, নরম-শক্ত প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র শিশুর কিছু পছন্দ-অপছন্দ জন্মায়। বাবা-মায়ের অন্যতম কর্তব্য হল শিশুর এই পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া। খাদ্যমূল্য বজায় রেখে যে সমস্ত খাদ্য শিশুকে দেওয়া যেতে পারে সেই সমস্ত খাদ্যবস্তুকে শিশুর খাদ্য তালিকায় স্থান দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশুর এই খাদ্য তালিকার মধ্যে শিশুর পছন্দ অপছন্দকে গুরুত্ব দিলে তা তার মানসিক বিকাশের সহায়কও।

ঙ) শিশুর মল-মূত্র ত্যাগ :

শিশু যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করেছিল তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের, আহার গ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ কোন কিছুর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে পূর্বোক্ত সমস্ত কাজগুলিই করতে হয়। নতুন এই বাইরের পরিবেশের সঙ্গে শিশুকে মানিয়ে নেবার জন্য সমস্ত শারীরিক প্রক্রিয়ার ধরণও বদলাতে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন তেমন তাকে গ্রহণ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যের অন্যান্য অংশ মলের আকারে এবং মলের অতিরিক্ত অংশ মূত্রের আকারে বাইরে নির্গত হওয়ার প্রয়োজন হয়। বর্জ্য পদার্থ হিসাবে 'মল' এবং রেচন পদার্থ হিসাবে মূত্র দেহকোষে থেকে গেলে তা ক্রমে কলাকোষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়, ফলে মল-মূত্র ত্যাগের বিষয়টি শিশুর কাছে প্রাকৃতিক কর্ম হিসাবে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু শিশুর এই প্রাকৃতিক কর্ম অনেক ক্ষেত্রেই মায়েদের কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়। শিশু বার বার বিছানা নোংরা করবে, বার বার বিছানা ধুতে হবে, পায়খানা করে নোংরা অবস্থার মধ্যে শুয়ে থাকবে, এসব মায়ের পছন্দ নয়। এইসব পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা করে শিশুকে খাওয়ানোর পরই অনেক ক্ষেত্রে মল ত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। অনেক সময় নির্দিষ্ট নিয়ম করে মলমূত্র ত্যাগের জন্য শেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ধরনের চেষ্টার কোন লাভ নেই। উপযুক্ত বয়স না হলে শিশু এই ধরনের অভ্যাস রপ্ত করতে চায় না। ফলে জোর করে শিশুকে মলমূত্র ত্যাগ করানোতে বাধ্য করলে হিতে বিপরীত হবে।

শিশুর মল-মূত্র ত্যাগ কাজে যাতে একটা নিয়ন্ত্রণ আসে সে ব্যাপারে শিশুর একটা নির্দিষ্ট বয়সের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। শিশু এক বছর বয়স না হলে মল মূত্র ত্যাগ করার ব্যাপারে বিশেষ কোন সচেতনতা দেখা যায় না। দ্বিতীয় বছরই হল শিশুর মল-মূত্র ত্যাগ করার প্রশিক্ষণের উপযুক্ত সময়। দু'বছর বয়স হলেই শিশু পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুকরণ করে মল মূত্র ত্যাগ করার নির্দিষ্ট স্থানকে ব্যবহার করে। এই সময় তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব।

দুই থেকে আড়াই বছর বয়সে শিশু নিজে নিজে পোশাক খুলে যাতে মল মূত্র ত্যাগের নির্দিষ্ট স্থানটি ব্যবহার করতে শেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে বাবা-মা'কে। এই সময় মল মূত্র ত্যাগের ব্যাপারে যে বাবা-মা কোনোরকম ঘৃণার ভাব না দেখায়। আবার যদি কোন কারণে শিশু অনিয়মিতভাবে যেখানে সেখানে মল মূত্র ত্যাগ করে তবে তা নিয়ে তাকে বিশেষ বকাবকি করা উচিত নয়। এতে শিশুর মধ্যে অপরাধপ্রবনতা দেখা দিতে পারে, এই ব্যাপারে বাবা-মায়ের দায়িত্ব অনেক খানি।

চ) শিশুর খেলায় উৎসাহ প্রদান :

দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর খেলার সমগ্রী ছিল বাবা-মা ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সমবয়সী বন্ধুরা। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা শিশুর নিকট খেলার সঙ্গী হিসাবে প্রতিভাত হয়। এখন তারা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে খেলা করতে শুরু করে এবং এইভাবে ক্রমশ এগিয়ে আসে বাল্যকাল, কৈশোর এবং যৌবন। খেলার মধ্য দিয়ে যেমন শিশুর মানসিক চাহিদা মেটে তেমনি সংশ্লিষ্ঠ বিকাশও ঘটে। এই খেলাকে কেন্দ্র করেই শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটে থাকে।

এতদিন পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শিশুকে আসতে হয়নি। কিন্তু শিশুর খেলা এমন এক ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে শিশু বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। খেলার মধ্য দিয়ে সে সঙ্গীর মানসিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। খেলার মধ্য দিয়েই অন্যান্যদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ককে যে উপলব্ধি করতে পারে।

শিশুর খেলার ব্যাপারে বাবা-মা যেন অহেতুক অবদমনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করেন। অথবা জোর করে কোন খেলাকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। শরীর এবং মনের চাহিদাকে অবলম্বন করে শিশু নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যে খেলায় অংশগ্রহণ করে তাকেই সমর্থন করা উচিত। আর একটা কথা হল, শিশুর খেলায় তার যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া দরকার।

৬.৩.২ শিশুর মন, আবেগ ও সমাজসত্তার বিকাশে বাবা-মায়ের দায়িত্ব :

শিশুর ভয়, ক্রোধ ও ভালবাসা

ক) ভয় :

ভয় মানুষের জীবনে একটি মৌলিক প্রক্ষোভ বা আবেগ। বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভয় পায়। কোন একটি শিশু কোন পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছে তা নির্ভর করে শিশুটির কোন পরিবেশে বড় হচ্ছে এবং কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে তার উপর। শিশুটির মানসিক বিকাশের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। শিশুর বাবা-মায়ের একথাটি মনে রাখা দরকার যে শিশু কোন কারণে ভয় পেলেই তাকে অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করার কোনো কারণ নেই, এর মধ্যে অযৌক্তিক বিষয়ও নেই। দেখা দরকার শিশু কোন পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর ভয়ের বিষয় বস্তু, ভয়ের রূপ ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন যদি ঘটে তবে অবশ্যই বাবা-মাকে সতর্ক হতে হবে এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিতে হবে।

শিশুর অহেতুক ভয়ের ব্যাপারে নজর রাখা দরকার তার আচরণের দিকে। মায়ের সতর্ক দৃষ্টি শিশুর ভয়ের কারণকে অনায়াসেই চিহ্নিত করতে পারে। দেখা দরকার অবাঞ্ছিতভাবে বাবা-মা যেন শিশুর মধ্যে ভয়কে অনুপ্রবিষ্ট করে না দেন। অনেক সময় বাবা-মা নিজেদের সুবিধার কথা ভেবে ভয় দেখিয়ে শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রবণতা ঠিক নয়। শিশু কোন পরিস্থিতিতে, কোন অসুবিধার কারণে ভয়ের আশ্রয় নিচ্ছে তা মা-বাবাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশুর মনোভাবকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিশু খেতে না চাইলে, ঘুমোতে না চাইলে, মায়ের কাছে আসতে না চাইলে তাকে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব ভয় দেখিয়ে লাভ নেই; এতে অনেকসময় ভবিষ্যতে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

শিশু যখন ভয় পাবে তখন তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে, তাকে মানসিক সহায়তা দিতে হবে, তার মধ্যে নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। ভয়কে মোকাবিলা করা, দূর করার জন্য খেলাধূলা, ছবি আঁকা প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শিশু যাতে বাস্তবভাবে ভয়কে জয় করতে পারে তারজন্য বাবা-মাকে ধৈর্য্য সহকারে এগিয়ে যেতে হবে।

খ) ক্রোধ বা রাগ :

মানবশিশুর জন্মগ্রহণের প্রায় ছয় মাস বয়স থেকে মায়ের অস্তিত্ব থেকে নিজের অস্তিত্বকে আলাদা করে ভাবতে শেখে। এইজন্যই সে মা-কে কাছে কাছে রাখতে চায়, নিজের মতো করে পেতে চায়। যদি সে তার পছন্দ মতো মা-কে না পায় সে হয় ক্রুদ্ধ। বাস্তবের জগতে ক্রোধ ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। ক্রোধের উৎপত্তি ঘটে বিভিন্ন কারণে। শিশুর ভয় থেকে যেমন ক্রোধ জন্মায়, তেমনি প্রত্যাশা পূরণ না হলে কিংবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে এমনকি বাবা-মা নিজেদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক

পরিস্থিতিও শিশুর ক্রোধের কারণ হতে পারে। কিন্তু শিশুর মধ্যে ক্রোধের প্রকাশ দেখলেই চিন্তার কোন কারণ নেই। বাবা-মা কে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সেই ক্রোধ শিশু, তার বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেন কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। শিশুর রাগের পরিস্থিতিতে তার মা-বাবাকে তার নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হবে। শিশুর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার আত্মমর্যাদায় আঘাত না পায়। অন্যের সাথে তুলনার মাধ্যমে শিশুকে কখনোই অহেতুক ছোট করা উচিত নয়।

ভয় থেকে অনেকসময় যেহেতু শিশুর ক্রোধ জন্মায়, সেজন্য বাবা-মায়ের কর্তব্য হলো শিশুর ভয়ের পরিস্থিতিগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা। শিশুদের ক্রোধের অপর একটি পরিস্থিতি হলো মায়ের কাছ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা, বিশেষ করে কর্মরতা মায়ের ক্ষেত্রে শিশু দীর্ঘ সময়ের বিচ্ছেদে অসন্তোষ এবং নিরাপত্তা হীনতার সৃষ্টি হয় যার থেকে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হতে পারে। আবার কখনওবা তার ক্ষোভকে প্রশমিত করতে গিয়ে নিজেই কখন হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়।

শারীরিক অসুস্থতা যেহেতু শিশুর একটা ক্ষোভের কারণ তাই শিশুর খিটখিটে মেজাজ এবং ক্রোধের পেছনে কোন শারীরিক অসুস্থতার বিষয় আছে কিনা তা দেখতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাবা-মায়ের একথাটা মনে রাখা দরকার শক্তিশালী প্রক্ষোভ হিসাবে এই ক্রোধকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সৃজনধর্মী কাজে পরিচালিত করলে পারলে শিশুর সাথে সাথে সমগ্র পরিবারের কল্যাণ হতে পারে।

গ) ভালবাসা :

শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ষোভ হল 'ভালবাসা'। ভালবাসার দু'টি রূপ আছে— ভালবাসা চাওয়া ও ভালবাসা দেওয়া। পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষের মধ্যে ভালবাসা চাওয়ার দিকটি পরবর্তীকালে ভালবাসা দেওয়ার মধ্যে পরিণতি লাভ করে।

শিশুর মধ্যে ভালবাসা দেওয়ার ক্ষমতার যাতে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে সেদিকে বাবা-মা'র লক্ষ্য রাখতে হবে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশু যতই বাস্তবের সংস্পর্শে আসবে ততই তার আত্ম-প্রেমের কেন্দ্রবিন্দুটি স্থানান্তর ঘটবে, বিস্তৃতি ঘটবে। এইভাবে স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই চাই শিশু জীবনে একটি উপযুক্ত পরিবেশ, ভালবাসার পরিবেশ, যা প্রথম প্রকাশ ঘটে পরিবারের মধ্যে বাবা-মায়ের সান্নিধ্যেই। ভালবাসার পরিবেশেই শিশু ভালবাসা পাবে, অন্যদেরও ভালবাসা দেবে, ভালবাসতে শিখবে। শিশুর ভালবাসার প্রথম পাঠ শুরু হয় এই বাবা-মায়ের সংস্পর্শেই। প্রতিটি বাবা-মাকেই মনে রাখা দরকার যে, তাদের ভালবাসায় শিশু যেন আত্ম-প্রেমেই নিমগ্ন হয়ে না থাকে। বাবা-মা'র ভালবাসা যেন শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে বিস্তৃতির পথ দেখায়।

অনেক সময় শিশুর ভুল-ভ্রান্তির জন্য, সামান্য দোষের কারণে শাস্তি দেওয়ার প্রবনতা দেখায় বাবা-মা। এটি কিন্তু ঠিক নয়। এতে শিশুর মধ্যে ভালবাসা চাওয়া বা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা ব্যবাধান তৈরি করে এবং শিশুর আচরণে ঘৃণা, ক্ষোভ জন্মায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার তার অবদমন ঘটলে শিশুর মনের মধ্যে বাবা-মা'র প্রতি একটা ঘৃণাবোধ জন্মাতে পারে। শিশুর দোষটিকে বাবা-মা'কে ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা উচিত। অন্ততঃ বাবা-মা শাস্তি দিলেও শিশুর নিকট যেন তা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে না ধরে, শিশুর মধ্যে যেন এমন অনুভূতির সঞ্চার না হয় যে, তার বাবা-মা তাকে ভালবাসে না।

শিশুর জীবন অন্যদের তুলনায় সংকীর্ণ, ছোট পরিসরে, স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মধ্যে অল্পবিস্তর হীনমন্যতা থাকে। এই হীনমন্যতার ভাবকে কাটিয়ে তার মধ্যে আত্মনির্ভরশীল বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ভালবাসাই আসল অস্ত্র।

2) শিশুর স্বভাবকে উপলব্ধি করা : শিশুকে বোঝা বা উপলব্ধি করা বেশ কঠিন। তত্ত্বগতভাবে যতই আমরা শিশুকে বোঝার চেষ্টা করি না শিশু কিন্তু শিশুই। সে চলে তার আপন খেয়ালে। এই খেয়ালটিকেই আমরা অনেক সময় তুচ্ছ জ্ঞান করি। বড়রা শিশুদের নিতান্ত অধাচীন মনে করে তাঁদের পরিকল্পিত পথে চলতে বাধ্য করেন। ছোটদের নিজেদের মতো করে, তাদের প্রয়োজন অনুসারে বেশীরভাগ বাবা-মা চলতে রাজী নন। অভিভাবকরা অনেকসময়ই নিজেদের জীবনের অতৃপ্ত শৈশবকে তাঁর শিশুসন্তানের মধ্যে পেতে চায়। যুগ আর ব্যক্তি বৈষম্যের কথাকে গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অথচ অধিকাংশ শিশুর মধ্যেই একটি সহজ অন্তর্দৃষ্টি এবং নিজস্ব বিবেচনা শক্তি আছে, যা দিয়ে সে তার মত করে জীবন পথে চালিত হতে পারে। আর এখানেই বাবা-মা'র একটা বিশেষ দায়িত্ব হল উপযুক্ত স্নেহ, সহানুভূতি ও সহযোগিতা দিয়ে তাঁর শিশু সন্তানকে শিশুর নিজের জগতে, নিজের মতো করে বাস্তবকে উপলব্ধির করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

3) শিশুকে প্রশংসা ও উৎসাহ দান : আজকাল প্রায়ই একটা কথা শোনা যায় বাচ্চারা আগেকার মত বড়দের কথা মানছে না। বাবা-মা'র উপদেশ নিচ্ছে, বড়ই বেয়ারা হয়ে গেছে। এই ধরনের কথা কিন্তু ঠিক নয়। ছোট্ট চারাগাছকে যেমন বড় করার জন্য জল, মাটি, বাতাস, আলো প্রভৃতি উপাদান দিয়ে সযত্নে লালিত করতে হয়, আপনার শিশুটিকে তেমনি তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কিছু উপাদান, যেমন— প্রেরণা, উৎসাহ, ভরসা আর স্বাধীনতা দিতে হবে। এই ব্যাপারে বাবা-মা'কে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশু কোন কাজে সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থা পেলে; কখনো 'ছিঃ ছিঃ বাবা এসব করে না!' কিংবা 'এভাবে করা ঠিক হয় নি।' বলা ঠিক নয়, এতে শিশুর নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। শিশুর কাজে শুধু সাফল্য খুঁজতে যাওয়া বাবা-মা'র ঠিক নয়। বরং তাকে কাজ করতে সাহায়তা করুন, ভুলটা সংবেদনশীল মন নিয়ে সংশোধন করুন। সাফল্যের সঙয় 'বাহবা' দিন। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে, প্রতিবারের কাজেই নিত্য-নতুন বাহবা পাওয়া যায়। আসল কথা হল শিশুকে কাজের সময় গোড়াতে পয় দেখানো, পরে উৎসাহ, প্রেরণা ও স্বাধীনতা দানের মাধ্যমে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

4) শিশুদের সত্য ও মিথ্যাচার : শিশুদের বস্তু প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা এবং ধারণা গঠন ক্ষমতা যেহেতু দুর্বল, সেই কারণে কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে বাবা-মা বা বড়দের কাছে উপস্থাপন করা তাদের পক্ষে বেশ শক্ত। তাদের ভাষার দক্ষতা এমন উচ্চতায় থাকে না যে, সমস্ত ঘটনাকে স্বচ্ছন্দে অন্যের নিকট সহজ বোধ্য করে তুলতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের বহু ঘটনার বিবরণ দান যেমন অস্পষ্ট তেমনি অসংলগ্ন। এইজন্য শিশুদের অনেক কিছুকে আমরা তাদের মিথ্যাচার বলে মনে করি। এই ধরনের মিথ্যা অপবাদের দ্বারা শিশুরা অনেক সময় তাদের বাবা-মা ও পরিবারের বড়দের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়। ঘটনার প্রকৃত উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে হলে, তা সত্যের মর্যাদা পায়। এই ধরনের সত্য কথা বলার ক্ষমতা সে ধীরে ধীরে লাভ করে। সততা আর সচেতনতার দৃষ্টিভঙ্গির তাকে আরো বেশি সত্যবাদী করে তোলে। এই ব্যাপারে অভিভাবক বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্যদের যেমন হতে হবে সহিষ্ণু, সহানুভূতিশীল, সৎ ও সচেতন। বাবা-মা কোনভাবেই বানানো কথাকে শিশুর সামনে উপস্থাপনা না করেন। বাবা-মা নিজেরা যেন মিথ্যাচারের আশ্রয় না নেন, বরং শিশুর স্বাভাবিক ধারণা গঠন, প্রকাশক্ষমতা আর

বাসনাকে গুরুত্ব দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে ধীরে ধীরে শিশুদের সত্যবাদিতার মতো সদ্‌গুণ বিকাশের ব্যাপারে সহায়তা করেন। দায়িত্বশীল বাবা-মায়ের আর একটি কাজ হল সত্য ভাষণে সাহস অবলম্বন করা। সত্য কথা বলাতে বাবা-মা নিজেরাই সাহসী না হলে শিশুরা কিভাবে সাহস করে সোজা সত্য কথাটা বলবে? আর একটি বিষয় বাবা মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি যেন এমন না হয় যে, ভয় ও অবিশ্বাস শিশুকে মিথ্যা কথা বলতে প্ররোচনা দেয়। বরং যদি শিশুর বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য না হয় তবে সামনা-সামনি শিশুর সত্য-মিথ্যা বিচার না করে, সন্তর্পনে আড়ালে প্রকৃত বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে।

5) শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা : প্রথম শৈশব কাটিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ আড়াই থেকে তিন বছর বয়স থেকে শিশু মনের অজান্তেই আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। এই সব শিশুদের একটুখানি সময় একলা থাকতে দিতে হবে, বাবা-মা'র নিজেদের কতৃত্বকে একটু সংক্ষিপ্ত করে তাদেরকে আত্মসচেতন হয়ে ছোট ছোট কাজ করতে দিলে শিশুদের আত্মনির্ভরশীলতা জন্মায়। বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখায়।

6) শিশুর রাগ-জেদের প্রসঙ্গ : আত্ম প্রতিষ্ঠার মনোভাবকে শিশু কাজে লাগাবার সুযোগ না পেলে তার মর্যাদালাভের সুযোগ আসে না, তাই শিশু তখন ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই অবস্থায় তার ওপর মানসিক পীড়ন শুরু হলে সে বাবা-মা'র অবাধ্য হয়তে থাকে এবং ক্রমশ জেদী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বাবা-মা'র উচিত হবে শিশুটির রাগকে সহ্য করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা। বাড়ীর পরিবেশকে রুক্ষ মেজাজী স্বভাব পরিহার করে একটু নরম ও দরদী মন নিয়ে শিশুর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে বাবা-মা ও অন্যানদের এগিয়ে আসতে হবে।

7) শিশুর হিংসা-মনোবৃত্তি : বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্নেহ করবেন, ভালবাসবেন। কিন্তু সেই স্নেহ ভালবাসার আতিশয্যে যেন সন্তানকে দখল করে রাখার মানসিকতা পোষণ না করেন, তা না হলে তাদের নিজেদের মধ্যে যে হিংসা-মনোবৃত্তি পরে দেখা দেবে, তা থেকে সন্তানরাও সেই কু-মনোবৃত্তি লাভ করবে। দখলীসত্ত্বলোভী মনোভাব যেন বাবা-মা নিজেদের মধ্যে কিংবা ছেলেমেয়েদের মদ্যেও না থাকে। প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে চলতে দিলে এই সমস্যা অনেক কম হয়। যদি কোন কারণে শিশুর মধ্যে বিদ্বেষ মনোভাব চাপা থাকে তাহলে আরো ক্ষতি। তাই বিদ্বেষ মনোভাবের কারণ জেনে বাবা-মা'কে সাবধান হতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ কিংা দাবরানি দিয়ে হিংসুটে সন্তানদের এই রোগ সারানো যাবে না, এর জন্য চাই শিশুর নিকট সহজব্যাপী আর সন্তানদের ভরসার পাত্র-পাত্রী হতে হবে বাবা-মাকে।

8) অপরাধ প্রবনতা : শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর একটি হল অপরাধ প্রবণতা। কাকে বলা যাবে অপরাধ প্রবণতা? সমাজ-বিরুদ্ধ আরচণকেই বলা যেতে পারে অপরাধ প্রবণতা (Delin quency may be defined as anti-social behaviour. এখন প্রশ্ন হল ভবিষ্যতে কোন ধরনের শিশুর অপরাধী হয়? এর উত্তর আজকের অপরাধ বিজ্ঞানীরাও দিতে পারেন নি। তথাপি অপরাধ প্রবণতার পেছনে কতকগুলি কারণকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মনে করা হয় বাবা-মা না থাকলে, বাবা-মা থাকলেও যদি ভীষণ কঠোর বা নিষ্ঠুর হন, যদি সন্তান পরিবারে ভীষণভাবে অবহেলিত হয়, শিশু অপসংগতি সম্পন্ন হলে, মানসিক অসুস্থতা, প্রায়বিক বৈকল্য বা জটিলতা, শিশু প্রচণ্ড উদ্বেগ, ঘৃণা ও নিরাপত্তার স্বীকার হলে অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি হতে পারে। এতসব কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হল মায়ের ব্যক্তিত্বের আর মেজাজের প্রকৃতি।

শিশু যাতে অপরাধপ্রবণ না হয়ে ওঠে অথবা অপরাধপ্রবণতার বৃদ্ধি না ঘটে বা তার সংশোধন এই

জন্য মা-বাবা শিশুকে স্নেহ করুন, নিজেদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের স্বাভাবিকতা বজায় রাখুন, পারিবারিক পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ এবং শৃঙ্খলা পরায়ন করে তুলুন। পরিবারের মধ্যে একাধিক শিশু থাকলে প্রতিটি শিশুই যেন সমান ভালবাসা পায়। পরিবারের বিভিন্ন শিশুর মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়, শিশুকে অহেতুক মাত্রাতিরিক্ত তিরষ্কারও ঠিক নয়।

9) শিশুকে প্রশ্নকরণের কৌশল : শিশুর ভাষাবিকাশের সাথে সাথে শিশুর সঙ্গে পরিবারের বাবা-মা ও অন্যান্যদের যোগাযোগের সুযোগ বেড়ে যায়। এর ফলে বাড়ীর পরিবেশ ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের প্রশ্ন যেমন শিশুরা তাদের অভিভাবকদের করে তেমনি অভিভাবকরাও নানা প্রশ্ন করেন এই শিশুদের। কিন্তু শিশুদের প্রশ্ন করার ভাষা কেমন হবে, প্রশ্ন করার কৌশলই কেমন হবে? এটা ঠিক যে, শিশুর ভাষা বিকাশ অনেকটা হলেও ধারণা গঠনের বিস্তৃতি তখনও তেমন ঘটে না। তাই তাদের কাছে এমন প্রশ্ন করা যাবে না যার উত্তর দিতে শিশুদের ভাষাগত ব্যাঘাত ঘটে। আবার রুক্ষ বা রূঢ় ধরনের প্রশ্ন শিশুদের মনে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে শিশু স্বচ্ছন্দে, তার ক্ষমতা অনুযায়ী ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, নতুবা সে অস্পষ্ট উত্তরে দেবে অথবা মিথ্যা কথা বলবে। বিপরীত ভাবে বাবা-মায়ের প্রশ্ন করার কৌশল সহজ স্বচ্ছন্দ হলে শিশুর উত্তর দেওয়া যেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়, তেমনি প্রশ্ন থেকে উৎসারিত উদ্দীপনা শিশুর কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলতে পারে। এই প্রসঙ্গে বাবা-মায়ের মনে রাখা দরকার প্রশ্নের বাক্য হবে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সরল ও বাস্তব অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক।

10) জ্ঞানের বিকাশক্রম ও প্রথাগত শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি : এই বিশ্বসংসারে নিজের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করে তোলাই মানবশিশুর মূল লক্ষ্য। এই অস্তিত্ব সুরক্ষার প্রশ্নেই মানবশিশুকে এই বিশ্বপ্রকৃতির সমগ্র বস্তু জগৎ এবং সমাজ পরিবেশের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলে। সুতরাং অভিযোজন বা খাঁপ-খাইয়ে নেওয়ার জন্য শিশুকে পরিচিত হতে হয়, ধারণা গঠন করতে হয় এই বস্তু জগৎ আর সমান পরিবেশে বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্কে। কীভাবে সেই কার্যসম্পন্ন হয়? জন্মের পর থেকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষণই তার ধারণা গঠনে সহায়তা করে। বস্তুজগৎ সম্পর্কে এই ধারণা গঠন তথা প্রত্যক্ষনের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয় সংবেদন। মানবশিশু তার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে পঞ্চ অনুভূতি— দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ, যা লাভ করে তা-ই শেষ পর্যন্ত তাকে বস্তুজগতের সঙ্গে আচরণে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং ইন্দ্রিয় অনুশীলন বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজের চর্চা এবং উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। এর থেকেই ঘটে শিশুর জ্ঞানের উন্মেষ সাধনের ধারা। ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনের জন্যই দরকার বাবা-মা'র একান্ত সান্নিধ্য, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে শিশুর পরিচিত। পরিবেশকে কেন্দ্র করে শিশুর কৌতুহলকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। বরং শিশুর কৌতুহলকে পরিতৃপ্ত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বস্তুজগতের এই ধারণা লাভের সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হতে থাকে পরিবেশে বিভিন্ন ঘটনার কার্য-কারণ-বিশ্লেষণের সম্পর্ক স্থাপন এবং বিশ্বজগতের সমগ্রভাব সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। এই ভাব সত্তার সঙ্গে শিশু নিজেকেও সংযোজিত করে চলতে থাকে সামগ্রিক সমন্বয়ের কাজ। এই সমগ্র কাজের ধারাটির চল শিশু পবিারের সদসয্যদেরসঙ্গে তার প্রাথমিক পরিবেশেই। প্রথাহীনভাবে এই জ্ঞানলাভের ধরনই শিশুকে পরবর্তীকালে প্রথাগত শিক্ষার পথে অগ্রসর করে। জ্ঞানের বিকাশ ক্রমে পরিবারের বা বাবা-মায়ের সীমা বদ্ধতা কাটিয়ে শিশুকে ছুটতে হয় বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষকের নিকট কোন বিদ্যানিকেতনে। সূচনা হয় শিশুর প্রথাগত শিক্ষার। জ্ঞানের বিকাশের ধারা সংযুক্ত হয় আর এক নতুন পরিবেশে। পুরাতন পরিবেশের সঙ্গে নতুন পরিবেশের তখন প্রয়োজন হয় সমন্বয়ের। এই সমন্বয়ের কাজে পিতামাতার ভূমিকা অনেকখানি।

বিদ্যালয় আর গৃহের এই শিক্ষাদানের দায়িত্বকে দেখা যায় তাহলে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যায়—

১) কোল্ড, নীরব-জীবন। শিশু তার অনুভূতি দিয়ে শুধু উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে যখন।

২) মানসিক ক্রিয়ার উন্মেষ সাধন। শিশু তার মন বা চেতনা দিয়ে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করবে যখন।

৩) শারীরিক ক্রিয়ায় প্রকাশ ঘটানো। মন বা চেতনার সমস্ত ভাবশক্তির বাহ্যিক প্রকাশ ঘটাবে বাস্তব কোন কর্ম প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে।

এই তিন ধরনের কার্য প্রণালীই মানুষের জীবনের সম্মিলিত ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং একদিকে অখণ্ড বিশ্বসত্তার সঙ্গে সমন্বয় সাধন অন্যদিকে প্রথাগত শিক্ষার প্রস্তুতি— এইভাবে ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্যে শিশু এগিয়ে তার পিতামাতা ও পরিবারের হাত ধরেই।

11) বাবা-মা'র সহনশীলতা : শিশু স্বভাব চঞ্চল। তার আচরণের এই চাঞ্চল্যকে, কোন কোন সময় অবাধ্যতাকে (বড়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে) বাবা-মা'কে মেনে নিতে হবে, সহ্য করতে হবে। গায়ের জোরে বল প্রয়োগে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা ঠিক হবে না। পেশী শক্তিতে শিশুরা কমজোরি হলেও মানসিক শক্তি অনেক সময়েই বড়দের তারা হার মানায়। আধুনিককালে মনোবিদরা (যেমন— জঁযা পিঁয়াজে) শিশুকে তাঁর মত করে বড় হতে দেওয়াকে সমর্থন করেছেন। শিশু ঈশ্বর এর সন্তান আমাদের সনাতন বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে তার উপর বাবা-মা'র কর্তৃত্বকে চাপিয়ে না দেওয়াটাই উচিত। প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রুশোর মতকে যতখানি সম্ভব শিশুকে তার প্রকৃতি বা স্বভাব অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়াটাই বাবা-মা'র উচিত কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাবা-মা সহনশীলতার নীতি এগিয়ে এলেই শিশুর মঙ্গল। সন্তানের মর্যাদা বাবা-মা'র হাতেই। বাবা-মা'কে সেই কাজটি পালন করতেই হবে অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গেই।

12) শিশুকে সময় দেওয়া : দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততায়, জীবন জীবিকার বাস্তবতায় হয়তে সত্যিই বাবা-মা'র হাতে এমন সময় নেই যাতে তাঁদের শিশু সন্তান কিছুটা পেতে পারে। বাবা-মা'র শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এমন নয় যে, শিশু সন্তানের অতি অপরিণত জীবনের খেলাকে তাঁরা মেনে নিতে পারেন। তাঁদের রুচি, আগ্রহ, চিন্তা-চেতনা তাঁদের শিশু সন্তানের অনুসারী হয়তো একেবারেই উপযুক্ত নয়। তথাপি তাঁদের একটুখানি সময় বের করে, তাঁদের শরীর ও মনকে শিশুর মত করে, তাঁদের রুচি, আগ্রহ ও চিন্তাচেতনাকে শিশুসন্তানের খেলা অভিমুখী করতেই হবে। শিশুর খেলার উপকরণ হিসাবে শুধু মাত্র খেলনা কিনে দিলেই হবে না, প্রয়োজন তার খেলার সঙ্গী হিসাবে বাবা-মা'র নিজেদেরকেও সংযুক্ত করা। বাবা-মা'র জীবনের নমনীয়তায় তাঁদের নিজেদেরকে শিশুর পর্যায়ে উপস্থাপিত করতে হবে। বাবা-মা'র সঙ্গদান, তাঁদের অনুপ্রেরণা তাদের শিশুসন্তানকে উৎসাহিত করবে অনেকখানি। এতে লাভ তাদের শিশুসন্তানটির লাভ তাঁদের এবং সর্বোপরি পরিবার ও সমাজের। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাই বাবা-মায়ের তাদের শিশু সন্তানের জন্য একটুখানি সময় দিতেই হবে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় শিশুসন্তানের পরিচর্যায় বাবা-মা ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গুরুত্ব শিশুসন্তানের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মা-বাবাকে তাদের শিশুসন্তানের বিভিন্ন বয়সের বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় সম্পূর্ণ বিনা প্রস্তুতিতে। এই কাজের জন্য মা-বাবার কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আগেকার দিনে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধা-বৃদ্ধরা তাঁদের অভিজ্ঞতা পরিবারের নতুন মা-বাবাদের দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এইভাবে সন্তান-পালনের একটা ধারা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এখনো গ্রামাঞ্চলে এই ধারা কিছুটা বহমান। এতে সন্তান পালনের অনেক সমস্যার সুরাহা হয়। কিন্তু সমাজের একটি বড় অংশে এই সমস্যা

প্রকট। যেখানে নিউক্লিয়ার বা একক পরিবারের ছড়াছড়ি সেখানে এই সমস্যা মারাত্মক। তথাপি এমন একটা জরুরী বিষয়ের জন্য কোন ব্যবস্থাই আজও প্রথাগত বা প্রথাযুক্তভাবে গড়ে ওঠেনি।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৪ (Check your progress-4)

আপনার উত্তর ..... (এক বিষয় লিখতে হবে) .....

ক) শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের কর্তব্য কি?

খ) শিশুকে স্তন পান করানো প্রয়োজন কেন?

গ) মা-কে কেন সহনশীল হওয়া উচিত?

৬.৪ শিশুর জীবন বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব

বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রথাগত শিক্ষা শুরু হত প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। সেক্ষেত্রে শিক্ষালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে শিশু শিক্ষার্থী তার প্রথাগত শিক্ষা শুরু করতো। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা বলে তেমন কোন চল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ স্থানে গড়ে উঠেছে প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে আড়াই থেকে তিন বছর বয়সেই শিশুদের পাঠানো হয়। যে দায়িত্ব আগে পালন করতো পরিবারগুলি, সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে নার্সারি বিদ্যালয়গুলি। গ্রামাঞ্চলেও এই প্রবণতা অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে। শিশুদের এই বয়সটি হল অত্যন্ত স্পর্শকাতর, মানসিক ও প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য গঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব ও সুস্থ মানসিক গঠনের জন্য এই সমস্ত প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব কতখানি তা সহজেই অনুমান করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকার একটা সহানুভূতিসূচক কথা ও ব্যবহারে যেমন একটি শিশুর জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে, জীবন বিকাশের সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে, জীবনের ভালো দিকগুলির প্রতি অভিমুখী হতে পারে, ঠিক তেমনি অসঙ্গত আচরণ ও নেতিবাচক ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি শিশুর জীবনের অভিমুখকে বিভীষিকাময় করে তুলতে পারে তারও দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য যে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা যেমন অপ্রতুল তেমনি ত্রুটিহীন যথোপযুক্ত নয়। এই ধরনের প্রশিক্ষনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের প্রকৃতি, সমস্যা, সমস্যা

সমাধানের উপায় পান না তেমন কোন অভিজ্ঞতা পান না। অথচ এই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতেই গড়ে উঠছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব কতখানি এবং কিরূপ তা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

১) শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন : শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি সহজ সম্পর্ক স্থাপন। এই ধরনের সংবেদনশীল, সৃজনাত্মক কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সর্বাগ্রে তৃপ্ত থাকতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় পিতা/মাতা, তার মুক্তিদাতা/মুক্তিদাত্রী। শিশুর জীবনে বিদ্যালয় হল দ্বিতীয় গৃহ। এই গৃহের গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ যেন গৃহের পরিবেশকেই মনে করিয়ে দেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কার্যত শিশুর বাবা-মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

২) শিক্ষার্থীর প্রতি মর্যাদা দান : প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্রমেই যে বড় হচ্ছে, অনেক সময় এই বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে থাকে না। তাই অনেক সময়ে অন্যান্য সহপাঠিদের সামনেই কোন কোন শিক্ষার্থীর প্রতি মর্যাদা হানিকর কথা প্রয়োগ করা হয়, নানাভাবে অসম্মান করা হয়, শ্রেণিকক্ষে অপমান করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই ধরনের আচরণ ঠিক নয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই ধরনের আচরণ ঠিক নয়। এই ধরনের আচরণে যেমন শিশুর অত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়, তেমনি হীনমন্যতার জন্ম দেয়। সেইজন্য একটু বড় হলে শিশুর প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের।

৩) অতিরিক্ত চাপ তেকে শিশুকে মুক্ত রাখা : আড়াই থেকে তিন বছরের শিশুদের শহরাঞ্চলের নার্সারিতে বা প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠিয়ে বাবা-মা'রা অনেক সময় চাপের মধ্যে ফেলে দেন। আনন্দপূর্ণ পরিবেশে, হাসি-হৈ-হুল্লোর নিয়ে শিশুকে সময় কাটানোর সময় না দিয়ে বই-খাতার বোঝা, বিষয়বস্তুর বোঝা, অভিজ্ঞতা অর্জনের নামে কার্যত প্রচণ্ড চাপের মধ্যেই সময় কাটাতে হয় শিশু শিক্ষার্থীকে। এই ধরনের চাপ থেকে শিশু মুক্ত রেখে একটা আনন্দপূর্ণ পরিবেশে শিশুকে শিশুর মতোই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। অনেক সময় শিশুর উপর অতিরিক্ত চান শিশুকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সবসময় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

৪) অংশীভূত-বোধ (sense of belongingness) জাগরণ : মানুষের আত্মবিশ্বাসের একটা বড় কারণ হল একাত্মবোধ (sense of belongingness)। নিজেকে কোন কিছুর অংশ হিসাবে মনে করার মধ্যে দিয়ে এই ধরনের বোধ গড়ে ওঠে। শিশু প্রথম তার বিদ্যালয়কে গৃহের মতোই আপন করে ভাবতে শেখে, সে অনুভব করে এবং গর্ববোধ করে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসাবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে করে বাবা-মায়ের প্রতিভূ, সহপাঠিদের মনে করে তার ভাই-বোন বা পরিবারের সদস্য হিসাবে। শৈশবে সে জেনেছে তার বাবা মার, পরে জেনেছে সে পরিবারের তারও পরে সে অনুভভ করেছে সে কোন বিদ্যালয়ের। এইভাবে ধীরে ধীরে একাত্মবোধের জাগরণের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অনেকখানি। শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যবহার, আচার-আচরণ, ভালবাসা, সহানুভূতি, মমত্ববোধ শিষ্যর এই একাত্মতাবোধ গঠনে সাহায্য করে। কিন্তু এই সময় শিশু যদি বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভালোবাসা, সহানুভূতি ইত্যাদি না পায় তাহলে শিশুর মধ্যে একাত্মতাবোধের পরিবর্তে ভয়, উদ্বেগ, বিরক্তি, বিচ্ছিন্নতাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

৫) শিশুর মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন : শিশুর জীবনের প্রথমদিক অর্থাৎ তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের অভিজ্ঞতাই শিশুকে প্রভাবিত করে বেশি। গভীরভাবে রেখা পাত করে শিশুর মনে। এই সময় যে সমস্ত অভ্যাসমূলক কার্য শিক্ষক শিক্ষিকারা শিশুদের রপ্ত করতে দেন

সেগুলিই ধীরে ধীরে সু-অভ্যাস গঠনের ভিত্তি তৈরি করে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, ব্যবহার, সাধারণ কাজকর্ম শিশুদের প্রভাবিত করার মধ্য দিয়েই সু-অভ্যাসগুলি গড়ে উঠতে থাকে। এই ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই কিছুটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। সু-অভ্যাস গড়ে তোলার এটাই উপযুক্ত সময়।

৬) শৈশবের দৈহিক বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকা : শৈশবে শিশুর বিকাশের হার থাকে খুব বেশি। জন্মের পর থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তিন থেকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত সময়কাল প্রান্তীয় শৈশব নামে পরিচিত। এই স্তরটি মূলত প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করে শিশুশিক্ষার্থী। এই সময়কালে শিশু দেহ সঞ্চালনমূলক খেলাধূলা করে এবং এর ফলশ্রুতিতে তার দেহের গঠন বেশ মজবুত হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যায়। দৈহিক বিকাশের ফলে যে সব চাহিদা শিশুর মধ্যে দেখা যায় তার মধ্যে সক্রিয়তার চাহিদা ও পুনরাবৃত্তির চাহিদা প্রবল। স্বাভাবিকভাবেই খেলা ও হাতের কাজের প্রসঙ্গটি শিশুদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খেলাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে খেলাভিত্তিক শিক্ষা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব আছে। সেগুলি হল :

(i) শিক্ষণীয় বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী নির্বাচিত করতে হবে।

(ii) খেলার বিষয় বা পাঠ্যক্রমটিকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে খেলাভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীর বহুমুখী চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাবে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষনীয় বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্ককে ঘনিষ্ট করে তুলবে।

(iii) খেলা ভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলিকে 'সহজ থেকে কঠিন' এই নীতিতে বিন্যাস্ত করতে হবে।

(iv) বিদ্যালয় পরিবেশকে এমনভাবে সংগঠিত করা দরকার যাতে শিশু শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে ক্রীড়াধর্মী শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

(v) খেলা পরিচালনা এবং খেলা ভিত্তিক শিক্ষা চলাকালে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি প্রদর্শন, পারস্পরিক মত বিনিময়, স্নেহ-ভালবাসা সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(vi) শিক্ষার্থীকে স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে এবং অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।

৭) শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ও চাহিদা পূরণে শিক্ষক-শিক্ষিকা : শিশুর বয়স যতই আড়াই থেকে তিন এবং তার বেশি হতে থাকে ততই সে বাইরের বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে সক্ষম হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশু তার অর্থপূর্ণ ধারণা গঠন করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের বিকাশ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। জ্ঞানোন্দ্রিয়ের চর্চা যেমন বস্তুজগৎকে প্রত্যক্ষ করে ধারণা গঠনে সহায়তা করে তেমনি এই স্তরে শিশুর প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশুর এই প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে তার অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সমান্তরালভাবে। প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির বিকাশ ঘটে প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, স্মৃতি প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে, যেগুলিকে একত্রে বলা হয় প্রজ্ঞামূলক প্রক্রিয়া (cognitive process)। বাইরের পরিবেশের যে জগৎ তাকে জানার এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধির যে ক্রমিক পরিণতির প্রক্রিয়াই হল প্রজ্ঞামূলক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ধারাকে বলা হয় প্রজ্ঞামূলক বিকাশ। প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানী জ্যাঁ পিয়াজেঁ। তিনি মনে করেন শিশুর প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে চারটি স্তরে মাধ্যমে—

(i) সংবেদন সঞ্চালন স্তর (জন্ম থেকে ২ বছর)
(ii) প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (২ থেকে ৭ বছর)
(iii) মূর্ত সক্রিয়তার স্তর(৭ থেকে ১১ বছর)
(iv) যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (১১ থেকে কৈশোরের শেষ পর্যন্ত)

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে শিশুর প্রাক্ সক্রিয়তার স্তরটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কারণ এই বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিশুরা আসে তাদের বয়স সাধারণত ২ থেকে ৬-এর মধ্যে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার দায়িত্ব অনেকখানি। প্রাক্-সক্রিয়তা স্তরের শিশুদের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—

ক) নিজের কল্পনার জগতের বাইরে বাস্তবজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি ঘটে।
খ) প্রথমদিকে সর্বপ্রাণবাদ সক্রিয় হলেও শিশু ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে— জড় জগৎ, জীব জগৎ, সজীব প্রাণী এবং জীবিত প্রাণীদের চেতনার অস্তিত্ব।
গ) অহংবোধের চিন্তায় শিশু বিভোর থাকে (ego centric)।
ঘ) বিপরীতধর্মী চিন্তনে সে অক্ষম থাকে (reverse thinking)।

প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুরে এই বৈশিষ্ট্যগুলি খেয়াল রেখে শিশুর শিক্ষনে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন—

(i) শিশুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণকে অনুকরণ করতে পারে
(ii) খেলার সময় বিভিন্ন ধরনের সত্যিকারের আচরণের ভান করতে পারে।
(iii) শিশুরা তাদের চিন্তনের প্রতিফলন ঘটাতে পারে ছবি আঁকার মাধ্যমে।
(iv) শিশুদের চিন্তার বাহন হিসাবে কাজ করে ভাষা। এজন্য ভাষার বহুল ব্যবহার ঘটে।

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের এই সমস্ত স্বাভাবিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে পরবর্তী স্তরের দরকারী দিকগুলির কথা চিন্তা করে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

৮) শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকা : ভয়, ক্রোধ, আনন্দ, দুঃখ, ঈর্ষা প্রভৃতিকে এক কথায় বলা হয় আবেগ বা প্রক্ষোভ। মানবজীবনের একটি অতি প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। আবেগ বা প্রক্ষোভের অভিজ্ঞতা প্রতিটি মানুষের থাকে। এক একটি প্রক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে এক এক রকমের অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তাদের বহিঃপ্রকাশের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন ভিন্ন রকম। প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন— প্রজ্ঞামূলক উপাদান, অনুভবমূলক উপাদান এবং সঞ্চালনমূলক উপাদান। শিশুদের প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে এই তিনপ্রকার উপাদান বড়দের থেকে আলাদা। প্রকৃতপক্ষে শিশু যতই তার পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে ততই তার উপাদানগুলির পবির্তন হতে থাকে। প্রক্ষোভের উপাদানগুলির সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের এই ধারাই হল প্রক্ষোভমূলক বিকাশের মূল কথা।

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মধ্যে সাধারণভাবে যে সমস্ত প্রক্ষোভগুলি দেখা যায়, সেগুলি হল— ভয়, রাগ, আনন্দ, দুঃখ, ঈর্ষা, কৌতুহল, হিংসা, স্নেহ প্রভৃতি। এই স্তরের শিশুদের প্রক্ষোভের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে—

(i) শিশুদের প্রক্ষোভের তীব্রতা খুব বেশি। নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা খুব কম।
(ii) শিশুদের প্রক্ষোভমূলক অবস্থার স্থায়িত্বকাল খুব কম। সহজেই নিরসন ঘটে।
(iii) শিশুদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া খুব বেশি পরিবর্তনশীল। কোন একটি মুহূর্তে শিশু ভীষণ রাগাান্তি আবার পরমুহূর্তেই দেখা যায় আনন্দের আতিশয্য।

(iv) শিশুদের প্রায় সফল আচরণ প্রক্ষোভধর্মী বা প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রিত।

(v) অভিজ্ঞতালাভ বা শিক্ষার প্রভাবে প্রক্ষোভগুলি নিয়ন্ত্রণ যোগ্য।

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে খেয়াল রেখে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকখানি দায়িত্ব বর্তমান। শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভগুলির ভূমিকা যথেষ্ট।

একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা যিনি শিশুর চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল। এবং শিশুর প্রক্ষোভ অনুযায়ী তাকে স্নেহশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন তিনি সহজেই তাকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করতে সক্ষম; তার অস্বাস্থ্যকর প্রক্ষোভগুলিকে স্বাস্থ্যকর প্রক্ষোভে রূপান্তরিত করে শিশুকে তার গঠনমূলক জীবনের দিকে পরিচালিত করতে পারবেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্নেহশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে তিনি সহজেই শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষন কার্যে সাফল্য লাভ করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান বা অভিজ্ঞতার প্রদানের আগে শিশুদের সাথে একটি মানসিক সংযোগ সাধন দরকার। সেক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা তার সহৃদয় ব্যক্তিত্ব, সংবেদনশীল মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশকে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপযোগী করে তুলতে সক্ষম হন।

খেলাধূলার মাধ্যমে, গল্পের মাধ্যমে, নাচ-গান, নাটকের মাধ্যমে, ভ্রমণ এবং বিভিন্ন প্রকার সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা সহজেই শিশুদের আপন করে নিয়ে তাদের প্রক্ষোভগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার মধ্য দিয়ে শিশুদের নিজেদের প্রক্ষোভমূলক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখাতে বা অভিজ্ঞতা প্রদানে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

শিক্ষক/শিক্ষিকার মনে রাখা দরকার যে, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষার মতো নেতিবাচক প্রক্ষোভগুলি শিশুকে নেতিবাক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি করে শিশুর জীবনে বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলে। অসুখী শিক্ষার্থী কখনো শিখনে সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিশুর নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস। বন্ধুত্বপূর্ণ স্নেহশীল পরিবেশ শিশুকে যেমন নিরাপত্তা দেয় তেমনি তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটায়। এর ফলে শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশের ধারা সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত হতে পারে। এক কথায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি জোর দেবেন—

(i) শিশুকে যথাযথ নিরাপত্তা দান,

(ii) প্রক্ষোভজনিত উদ্বেগকে হ্রাস করে, তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো,

(iii) শ্রেণিকক্ষে স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি করা,

(iv) শিক্ষার্থীর অনুভূতিকে গ্রহণ, সজনশীল হওয়া, শ্রদ্ধা করা।

৯) শিশুর সামাজিক বিকাশে শিক্ষক/শিক্ষিকার দায়িত্ব : 'সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণায় শিশু' এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম মানুষের যেমন একটি জৈবিক সত্তা আছে, তেমনি আছে তার সামাজিক সভা। কিন্তু তার সামাজিক সত্তা শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক সত্তায় পরিণতি লাভ করে। এই ধরনের সাংস্কৃতিক সত্তা মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্তার বিকাশে শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা ও দায়িত্ব কতখানি। এই দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনার আগে শিশুর এই ধরনের বিকাশের বৈশিষ্ট্যটি জানা দরকার একটুখানি।

মনোবিজ্ঞানী এরিকসনের মনো সামাজিক বিকাশের ধারণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, জন্মের সময় প্রথম থেকেই অহম (Ego) এবং অদস (Id) এই দু'টি স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। অহম (Ego) স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে প্রথম থেকেই থাকে সক্রিয়। স্বাধীন সত্তা হওয়ার ফলে অহম দ্বন্দ্ব মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিকাশ অগ্রসর হওয়ার দরুণ অহমের স্বকীয়তা

এবং সমাজ পরিবেশের পরিস্থিতি এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ক্রমশ সমাজ পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির নিরন্তর অভিযোজন এর মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটতে থাকে। ব্যক্তি ও সমাজের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের ধারা অগ্রসর হতে থাকে এবং সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ার উপর অহমের বিকাশ নির্ভরশীল। অহং সত্তার বিকাশের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে থাকে।

এরিকসনের মতে মনোসামাজিক দ্বন্দ্ব এবং অহমের বিকাশ ঘটে কয়েকটি পর্যায়ে। এই পর্যায়গুলির সংখ্যা হল চার। প্রতিটি পর্যায় আবার কয়েকটি উপস্তরে বিভক্ত। এরিকসন মোট আটটি স্তরের কথা বলেছেন—

প্রথম স্তর : জন্ম—১ বছর
দ্বিতীয় স্তর : ১ থেকে ৩ বছর
তৃতীয় স্তর : ৩ থেকে ৬ বছর
চতুর্থ স্তর : ৬ থেকে ১২ বছর
পঞ্চম স্তর : ১২ থেকে ১৮ বছর
ষষ্ঠ স্তর : ১৮ থেকে ২০ বছর
সপ্তম স্তর : ২০ থেকে ৫০ বছর
অষ্টম স্তর : ৫০-এর উর্দ্ধে

উপরোক্ত স্তরগুলির মধ্যে মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরটি প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত সামাজিক আচরণগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলির ভিত্তিতেই প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া দরকার।

শিশুর জীবনের প্রথম স্তর গৃহ পরিবেশে বাবা-মা'র কাছে শুরু হয়েছিল আস্থা ও অনাস্থার দ্বন্দ্ব নিয়ে। বাবা-মা'র প্রতি আস্থা সৃষ্টি হলে শিশুরা স্বাভাবিক সক্রিয়তার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা পেতে চায় তাদের দ্বিতীয় করে। সাবধানতার সঙ্গে শিশুকে যদি স্বাধীনতা ভোগ করতে দেওয়া হয় তবে তার মধ্যে আত্মনির্ভরতা জন্মায়। বিদ্যালয়ে যদি শিশুর আত্মসক্রিয়তা বাধা দেওয়া হয় তবে তার মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা কমে গিয়ে নিজের প্রতি সন্দেহ জাগে এবং অনেক কাজেই ব্যর্থ হতে হয়। ব্যর্থতার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলে তার মধ্যে লজ্জার প্রকাশ ঘটে। একেই বলা হয় স্বাধীনতা বনাম লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব।

তৃতীয় স্তরে শিশু তার স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, ভাষা বিকাশের ফলে নিজে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা কাজে উদ্যোগ নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে চায়। বস্তু জগৎকে জানতে চায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি স্বাধীনতা প্রবন শিশুকে তার সব উদ্যোগে বাধা না দেন তবে শিশু আরও কৌতুহলী ও অনুসন্ধিৎসু ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরিবর্তে শিশুর উদ্যোগের ক্ষেত্রটিকে অনুৎসাহিত বা সঙ্কুচিত করে দিলে সেভাবে তার কাজ সঠিক হচ্ছে না, সে ভাবে যে অন্যায় কাজ করছে। তার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জন্মায়। একেই বলা হয় উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ।

শিক্ষার কাজ যেহেতু শিশুর ব্যক্তির বিকাশে সহায়তা করা সুতরাং সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুর লজ্জা ও সন্দেহের দূর করে স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আবার কর্মচঞ্চল শিশুর সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য, শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য শিশুকে সব সময় উৎসাহিত করা, অনুপ্রেরণা

দান করে কর্মউদ্যোগী শিশুতে পরিণত করা শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব। শৈশবেই শিশু যদি হীনমন্যতার শিকার হয়, লজ্জা আর সন্দেহ প্রবন হয়, আত্মনির্ভরতা যদি কম হয় তাহলে তার ব্যক্তিত্ববিকাশ যেমন ব্যাহত হয় তেমনি সামাজিকীকরণও ব্যাহত হয়। সেই ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হবেন।

শিশু শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি আচরণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল আচরণগুলি সামাজিক আচরণ নামে পরিচিত। সাধারণত পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত যে সব প্রধান প্রধান সামাজিক আচরণ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল— অনুকরণ, রেষারেষি, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সামাজিক স্বীকৃতি, ভাগাভাগি করা এবং সান্নিধ্যমূলক আচরণ।

এই সমস্ত সামাজিক আচরণগুলির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে কতকগুলি অসামাজিক আচরণও লক্ষ্য করা যায়, যেমন— বড়দের সমস্ত কতৃত্বের বিরোধিতা করার প্রবনতা, আক্রমনাত্মক ক্রুদ্ধ আচরণ, ছোটদের উপর খবরদারি করা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ধ্বংসাত্মক আচরণের প্রবনতা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব হল এই সময় শিশুদের সামাজিক আচরণগুলিকে ক্রমশ দৃঢ় করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা এবং অসামাজিক আচরণগুলিকে মার্জিত হতে সাহায্য করা। এর ফলশ্রুতিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সামাজিক বিকাশের ধারা স্বাভাবিকভাবে সমাজ স্বীকৃত পথে অগ্রসর হতে পারে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-৫ (Check your progress-5)

নির্দেশ . . . . . (এক বিষয়) . . . . . .

ক) অতিরিক্ত চাপে থেকে শিশুকে মুক্ত রাখার উপায় কি?

খ) শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশের প্রয়োজন কেন?

গ) শিশুর সামাজিক বিকাশে শিক্ষকের দুইটি দায়িত্ব লেখ।

৬.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর পিতা-মাতার দায়িত্বকে বৃহত্তর ভাবে দু'ভাবে ভাগ করা হয়

ক) শিশুর শারীরিক বিকাশ, যত্ন ও পরিচর্যা;

খ) শিশুর মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশে সাহায্য করা।

মায়ের গর্ভ অবস্থা থেকেই বিভিন্ন ক্ষেএত্র মায়ের যত্ন এবং পরিচর্যা করা দরকার। কারণ মায়ের পুষ্টি, সুস্থ শরীর, স্বাভাবিক মন গর্ভের শিশুকেও একইভাবে সাহায্য করে।

এছাড়া শিশুর স্বভাবকে বোঝা, শিশুকে প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদান, শিশুদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যাচারের কুফল শেখানো, শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। শিশুর জীবন বিকাশে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্বও কম নয়। এই দায়িত্ব প্রাক প্রাথমিক স্তরে আরো বেশী। এই স্তরে শিক্ষক/শিক্ষার্থী শিশুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবেন, শিক্ষার্থীকে মর্যাদা দেবার চেষ্টা করবেন, অতিরিক্ত চাপ থেকে শিশুকে মুক্ত রাখবেন, অনুভূতি বোধ জাগাতে চেষ্টা করবেন, সু-অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করবেন ইত্যাদি। শিশু শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ ঘটানোও এই সময় শিক্ষক/শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেই পরে।

৬.৬ অনুশীলনী (Exercise)

ক) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) গর্ভবতী মায়ের কোন ভাবেই নেশা করা উচিত নয় কেন?

(ii) দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর খেলার সাথী কারা?

(iii) শিক্ষক/শিক্ষিকা কিভাবে শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবেন?

(iv) পিয়াজেঁর মত অনুসারে শিশুর বিকাশের স্তরগুলি কি কি?

খ) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) শিশুর টীকাকরণ প্রয়োজন কেন?

(ii) শিশুকে প্রশ্ন করণের কৌশল গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(iii) শিশুকে প্রাক্ষোভিক বিকাশে শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা লিখুন।

(iv) শিশুর সামাজিক বিকাশে কোন কোন আচরণ গুরুত্বপূর্ণ?

গ) নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) শিশুর ভালবাসা প্রয়োজন কেন?

(ii) শিক্ষক কিভাবে শিশুর মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন করবেন?

(iii) শৈশবে দৈহিক বিকাশে শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা লিখুন।

(iv) শিশুর সামাজিক বিকাশ বলতে কি বোঝায়?

৬.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত-৪ (Hints of answer to check your progress-4 and 5)

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৪

(ক) কোনভাবে অসুখে পড়বেন না, হাটা-চলা ইত্যাদিতে সতর্ক হওয়া, নেশাকারক দ্রব্য গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

(খ) মাতৃদুগ্ধে কোলাস্ট্রাম রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

(গ) পিতা-মাতার সহনশীলতা শিশুর বিকাশে সাহায্য করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর সংকেত-৫

(ক) আনন্দদায়ক পরিবেশ এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সহৃদয় ব্যবহার।

(খ) শিশুদের প্রক্ষোভ বড়দের থেকে আলাদা। প্রোক্ষভের সঠিক বিকাশ না হলে শিশুর মানসিক প্রকৃয়া ব্যহত হয়।

(গ) i. শিক্ষক শিশুর উদ্যোগকে উৎসাহিত করবেন। ii. শিশুর অনুসন্ধিতসা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন।

একক ৭ ❑ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education at Pre-primary Level)

গঠন **(Structure)**

৭.১ ভূমিকা **(Introduction)**

৭.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৭.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা কি? **(What is Health Education?)**

৭.৩.১ প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার গুরুত্ব **(Importance of Health Education at Pre-primary Schools)**

৭.৩.২ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য বিধি **(Personal and Community health principles)**

৭.৩.৩ মানসিক স্বাস্থ্য **(Mental health)**

৭.৩.৪ সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি **(Community health and hygiene)**

৭.৪ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শন **(School health inspection)**

৭.৫ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

৭.৬ অনুশীলনী **(Exercise)**

৭.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints of answer to check your progress)**

৭.১ ভূমিকা (Introduction)

সুস্থ দেহ সুস্থ মনের আধার। শিশু শিক্ষার্থী যদি স্বাস্থ্যবান না হয়, তার মন যদি সতেজ ও সবল না হয় তবে তার পক্ষে যথার্থভাবে শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে শিশু ও তার পরিবেশের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে শিশুর স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিষয়। শিশু শিক্ষার্থীদের যদি সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন গড়ে তুলতে হয় তবে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অল্পবিস্তর আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্যশিক্ষা বা স্বাস্থ্যসচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা বা স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অভ্যাস গঠনের জন্য কোনো ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না অথচ স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে তত্ত্বগত বা বাস্তব অভিজ্ঞতা দান, আধুনিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ধারণা গঠন, স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি শেষ করার পর আপনি—

- স্বাস্থ্য শিক্ষা কি জানতে পারবেন;
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন;
- ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি জানতে, বুঝতে এবং শিশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন;
- বিদ্যালয়, বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় পরিদর্শন-এর গুরুত্ব কি বুঝতে পারবেন।

৭.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা কী? (What is Health Education?)

সাধারণভাবে স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির দৈহিক সুস্থতাকে বোঝানো হলেও এটি কিন্তু সংকীর্ণ ধারণা। মানবশিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার চারপাশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এই দুই প্রকার পরিবেশেরই বিভিন্ন উপাদান ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং পরিবেশ যদি সুস্থ থাকে তবে ব্যক্তির স্বাস্থ্যও সুস্থ হয়। ব্যক্তির দেশের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে নানা রকমের চেতনা আর আবেগ জড়িত। এজন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা একটি ব্যাপক ধারণা। বর্তমানে বিশেষজ্ঞদের ধারণায়— "স্বাস্থ্য ব্যক্তির একটি সার্বিক অবস্থা, যে অবস্থায় ব্যক্তি তার বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও শারীরিক সম্পকগুলিকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কর্মে সুষ্ঠভাবে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়।" সুতরাং স্বাস্থ্যশিক্ষা বলতে শুধুমাত্র তত্ত্বগত জ্ঞানলাভের বিষয় নয়, এটি বাস্তব ব্যবহারিক অবস্থার শিক্ষাও বটে। আবার ব্যক্তি তার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক গুলিকে ব্যবহার করে থাকে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে সমাজ বা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যের বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কিত।

ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক জীবনে কীভাবে সুস্থতার সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক ক্ষমতাকে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে পারে, সেই শিক্ষাই হল স্বাস্থ্যশিক্ষা। পুঁথিগত জ্ঞানার্জন এর সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নীরোগ ও সুস্থ দেহে আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহে অভ্যস্থ হওয়াই হল স্বাস্থ্যশিক্ষার মূলকথা।

অনেক সময় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene) এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education) শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তা সঠিক নয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হল এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, অথবা স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থা রীতি-নীতি সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞান দেওয়া হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলি যে পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তা-ই হল স্বাস্থ্যশিক্ষা। অর্থাৎ স্বাস্থ্যশিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার রীতি-নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়।

৭.৩.১ প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার গুরুত্ব :

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আসে তাদের বয়স সাধারণত আড়াই বছর থেকে ছয় বছর

পর্যন্ত হয়। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য তাদের জীবনের ভিত্তি। এইসব শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। এদের সুস্থতাই দেশের সামগ্রিক সুস্থতার প্রতীক। সুতরাং দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড এই সব শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এইসব শিশু শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্থে মানবসম্পদে পরিণত করার প্রাথমিক দায়িত্ব যাদের তাদের স্বাস্থ্যশিক্ষার জ্ঞান থাকা দরকার তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক জীবন উভয় দিক থেকেই। সুতরাং প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স যেহেতু আড়াই থেকে ছয় বছরের মধ্যে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে কম। প্রতিনিয়ত তাদের রোগ জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এইসব রোগজীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের এমন কতকগুলি স্বাস্থ্যসংক্রান্ত রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়, যাতে স্বাস্থ্য রক্ষা অনেকটা সহজ হয়। দেহ-মনের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। এর সুফল তারা পায় তাদের দেহ, মনে, পরিবার ও বিদ্যালয় জীবনে। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার এই নিয়ম-কানুনগুলি সু-অভ্যাসের আকারে যদি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা পায়, তবে তা তারা পারিবারিক জীবনেও কিছুটা কাজে লাগাতে পারে। বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষা কার্যটিও সুসম্পন্ন হতে পারে। স্বাস্থ্যাভ্যাসের এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫৪-৫৬) কমিশন তার রিপোর্টে বলেছেন— "Every student in the school requires to be trained in sound health habits both at school and at home. The instruction should be practical so that he may not only apreciate the value of health education but also learn the ways in which he can effectively maintain and improve his health." সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হলে তার ভিত্তি রচনা করা দরকার প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের শুরুতেই।

শিক্ষার্থীর জীবনে তিনটি অস্তিত্ব বা সত্তা প্রধান। সেই তিনটি সত্তা হল তার দৈহিক বা শারীরিক সত্তা, মানসিক সত্তা আর সামাজিক সত্তা। ব্যক্তির দেহ, মন আর যে সমাজে সে বাস করছে, তার স্বাস্থ্য অটুট থাকলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সত্তার সুরক্ষিত থাকে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি, সমাজ, সর্বোপরি সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য আনন্দময় সুস্থ অবস্থায় অবস্থান করতে পারে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তবে অবশ্যই স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

৭.৩.২ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি (Personal and social health principles) :

প্রতিটি ব্যক্তি যাতে নিজের দেহ সম্পর্কে সচেতন ও যত্নবান হয় এবং নিজের চেষ্টায় স্বাস্থ্য সম্পদকে সুরক্ষিত করতে পারে, তাকে বলা যায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি। বি. এন. ঘোষের মতে "Personal hygiene deals with matters pertaining to the health of individual himself for the maintainance of which the responsibility lies with him alone." অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় স্বাস্থ্যবিধি নীতিগুলিকে ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে যেখানে আলোচনা করা হয়, তাই হল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির প্রধান তিনটি দিক হল— (i) ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, (ii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং (iii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য :

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি হল :

(i) স্বাস্থ্য সচেতনতা : ব্যক্তিকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই হল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনের যে কোন স্তরে ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, একটি হল বংশগতি, অন্যটি হল তার পরিবেশ। বংশগত বস্তু এবং পরিবেশগত অবস্থা ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। বংশগতিকে তেমনভাবে পরিবর্তিত করতে না পারলেও পরিবেশগত অবস্থাকে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় পরিবর্তিত করে নিজের অনুকূলে আনা সম্ভব। এর ফলে ব্যক্তি তার স্বাস্থ্যমান সম্পর্কেও সচেতন হতে পারে।

(ii) স্বাস্থ্যবিধিতে উৎসাহ প্রদান : স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন দিকগুলি শিক্ষার্থী পরিচিত হতে পারলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানগুলি সম্পর্কে সে ক্রমশ কৌতুহলী ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী ক্রমশ উন্নত স্বাস্থ্য ও জীবনযাপন উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

(iii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা : ব্যক্তির স্বাস্থ্য উন্নয়নের আগে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থানে অবনমনের সুযোগ না দিয়ে তাকে যথাযথভাবে রক্ষা করা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্ভব হলেই, পরবর্তী ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য উন্নয়নের কার্য আরো সহজ হয়।

(iv) অভিযোজনে সহায়তা করা : স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি শুধুমাত্র দৈহিক দিক থেকে অসুবিধা ভোগ করে না, মানসিক দিক থেকে অনেক সময় ভেঙে পড়ে, বা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে তার যে হীনমন্যতাবোধ জন্মায়, তা তার সার্বিক অভিযোজনে ব্যাঘাত ঘটায়। তার জীবনবিকাশের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি তাকে এই অসুবিধা দূর করে স্বাস্থ্যরক্ষায় যেমন সহায়তা করে তেমনি তার হীনমন্যতাবোধ দূর করে সার্বিক অভিযোজনে সহায়তা করে।

ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির মূল নীতি :

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির মূলনীতিগুলি অভ্যাস কেন্দ্রিক। কতগুলি সু-অভ্যাস গঠনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিকে সার্থক করে তোলা হয়। সেগুলি হল :

ক) স্বাস্থ রক্ষা ও খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত অভ্যাস :

১) খিদে পাওয়ার সময় সম্ভব হলে খাওয়া উচিত।

২) খাদ্যবস্তু নির্বাচিত হওয়া উচিত খিদে অনুযায়ী।

৩) ধীরে সুস্থে ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া দরকার।

৪) খাওয়ার সময় পড়াশোনা সংক্রান্ত কাজ না করাই উচিত।

খ) বিশ্রাম ও ঘুম সংক্রান্ত অভ্যাস :

১) ঘুমানোর নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত।

২) মশারি টাঙানোর পর পরিচ্ছন্ন বিছানায় ঘুমানো উচিত।

৩) ঘুমের পূর্বে কোন কঠিন সমস্যা নিয়ে চিন্তা না করা উচিত।

৪) রাত্রিতে খাওয়ার অন্ততঃ আধঘণ্টা পর ঘুমাতে যাওয়া উচিত।

গ) ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত অভ্যাস :

ত্বকের যত্ন — ১) প্রতিদিন পরিষ্কার ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করা দরকার

২) কোন কাজে ক্লান্ত হওয়ার পর হঠাৎ করে স্নান করা উচিত নয়।
৩) স্নানের পর পরিষ্কার শুকনো গামছা/তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে নেওয়া দরকার।
৪) স্নানের সময় নরম সাবান ব্যবহার করা উচিত।
৫) ত্বককে সুস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য সবসময় পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় ব্যবহার করা উচিত।

চুলের যত্ন — ১) স্নানের শেষে চুলকে শুকনো গামছা/তোয়ালে দিয়ে মুছে জল শুকিয়ে নেওয়া দরকার।
২) মাথায় অত্যধিক তেল দেওয়া উচিত নয়।
৩) সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন চুলে শ্যাম্পু নেওয়া উচিত।
৪) চুলের পুষ্টির জন্য ভিটামিন 'B' যুক্ত খাবার খাওয়া দরকার।
৫) দিনে বেশ কয়েকবার চুলে চিরুনী দেওয়া দরকার।

দাঁতের যত্ন — ১) প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আর রাতে খাওয়ার পর মোট দু'বার দাঁত মাজা উচিত।
২) ব্রাশ করার সময় মাড়ির ভেতর ও বাইরে হালকা সঞ্চালিত করা দরকার।
৩) যে কোনো খাবার খাওয়ার পর দাঁত মাজা উচিত।
৪) দাঁতের ফাঁকের খাবারকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলা উচিত।
৫) দাঁতের মাড়িকে ও দাঁতকে জীবাণুমুক রাখার জন্য মাঝে মাঝে লবঙ্গ খাওয়া যেতে পারে।
৬) দাঁত ভাল রাখতে হলে ভিটামিন 'C' যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

কানের যত্ন — ১) স্নানের সময় কানে যাতে জল না ঢোকে তার জন্য সোজা দাঁড়িয়ে অথবা বসে স্নান করা উচিত।
২) স্নানের পর নরম কাপড় দিয়ে কান পরিষ্কার করা উচিত।
৩) জোরালো শব্দের সময় কানে আঙুল দিয়ে বন্ধ রাখা উচিত।
৪) পেন, পেনসিল, কোনো শক্ত কাঠি বা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে কান খোঁচানো উচিত নয়।
৫) মাঝে মাঝে ডাক্তারের কাছে কানের ময়লা পরিষ্কার করানো উচিত।

চোখের যত্ন — ১) প্রত্যহ অন্ততঃ তিন/চারবার ঠাণ্ডা জলে চোখ ধোঁয়া উচিত।
২) চোখ মোছার জন্য নির্দিষ্ট তোয়ালে থাকা দরকার।
৩) চোখে ধুলো-বালি পড়লে জলের ঝাপটা দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার, চোখ কচ্‌লানো উচিত নয়।
৪) পড়াশোনার জন্য পর্যাপ্ত আলো থাকা দরকার এবং পরিমিত দূরত্বে বইকে রাখা দরকার।
৫) দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখার জন্য ছোট বয়স থেকেই সমজু শাকসব্জি টাকটা ফল ও ছোট মাছ খাওয়া ভালো।
৬) চোখের কোনো অসুস্থতায় দ্রুত চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত।

নাকের যত্ন — ১) প্রতিদিন স্নানের সময় নাকের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত।
২) যদি সবার সামনে নাক পরিস্কার করার দরকার হয়, তবে পরিষ্কার রুমাল ব্যবহার করা উচিত।
৩) দূষণযুক্ত ধোয়া সামনে থাকলে নাক চাপা দেওয়া দরকার।
৪) অযথা নাক চুলকানো বা নাক খোটানো উচিত নয়। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
৫) কোনো বস্তুর গন্ধ পাওয়ার জন্য নাকের খুব কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

নখের যত্ন — ১) নিয়মিত ছোট করে নখ কাটা উচিত।
২) ছোট নখের মধ্যেও যাতে কোনোভাবেই ময়লা না জমে তার প্রতি নজর রাখা উচিত।
৩) খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করা দরকার
৪) দাঁত দিয়ে নখকাটা কখনোই উচিত নয়।

পায়ের পাতার যত্ন — ১) প্রত্যেকবার পা ধোয়ার পর শুকনো পরিষ্কার গামছা/তোয়ালের দিয়ে পায়ের পাতা মোছা দরকার।
২) নখের কোনায় যেন কাদা বা ময়লা জমে না থাকে।
৩) খোলার মাঠে বা স্কুলে যাওয়ার সময় পা-ঢাকা জুতো ব্যবহার করা দরকার।
৪) খালি পায়ে হাটলে নুড়ি পাথর, পিন জাতীয় বস্তু থেকে সাবধানে হাটতে হবে।

নিয়মিত শরীর চর্চা — ১) প্রতিদিন নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করা উচিত।
২) ব্যায়াম করা দরকার খোলামেলা স্থানে।
৩) ব্যায়াম হবে পরিমিত এবং সকাল বা বৈকালে।
৪) ব্যায়ামের পর স্নান করা অথবা গা মোছা দরকার।

জল পান ও মলমূত্র ত্যাগ— ১) প্রতিদিন অন্ততঃ ৪/৫ লিটার জল পান করা উচিত।
২) পানীয় জল, বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা হওয়া দরকার।
৩) বেশী দৈহিক পরিশ্রমের পর অল্প-লবন চিনি মেশানো পরিষ্কার জল পান করা ভাল।
৪) নির্দিষ্ট স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা উচিত।
৫) মলমূত্র ত্যাগের স্বাভাবিক প্রবনতাকে চেপে রাখা উচিত নয়।

৭.৩.৩ মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health) :

দেহ ও মন নিয়েই ব্যক্তিসত্তা। দেহ নিয়ে যেমন তার দৈহিক স্বাস্থ্য তেমনি মন নিয়ে গঠিত হয় মানসিক স্বাস্থ্য। দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য কোনো বিচ্ছিন্ন অবস্থা নয়। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে ও ব্যক্তির নিজের সঙ্গে সার্থকভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ক্ষমতা। বাস্তব জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েও নতুন ধরনের পরিস্থিতিতে কার্যকরী পদ্ধতিতে সমাজ অনুমোদিত পথে

সমস্যার সমাধান করে একটি আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করাটাই হল মানসিক স্বাস্থ্যের মূল লক্ষণ। কোন ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কতখানি সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারে সেটাই তার সু-স্বাস্থ্যের পরিচয়। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির দেহ ও মনের সেই সু-সমন্বিত অবস্থা যা তাকে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্মতিবিধান বা অভিযোজনে সক্ষম করে তোলে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির নীতিগুলি যেমন পরিবারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তেমনি বিদ্যালয় পরিবেশেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা অবস্থান করে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বা স্বাস্থ্যবিধির বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দান করা সম্ভব নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে শিক্ষালাভ বা অভ্যাস গঠন সম্ভব। সেক্ষেত্রে পরিবারের শিশুর পিতা-মাতা এবং বিদ্যালয়ে তার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলি জেনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মূলত পরিবারে শিক্ষার্থীর মা ও বাবা এবং অন্যদিকে বিদ্যানিকেতনে তার শিক্ষক/শিক্ষিকা স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলিকে প্রয়োগ ও শিক্ষার্থীদের পরোক্ষভাবে সু-অভ্যাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দায়িত্ব সচেতনতার পরিচিয় দিতে পারেন। পরিবারে শিশুর মা ও বাবা এবং শিক্ষালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একবার যদি শিক্ষার্থীদের সু-অভ্যাস গঠনে সচেতন করতে পারেন তবে তা-ই একদিন পরবর্তী স্তরের ভিত্তি রচনা করবে।

৭.৩.৪ সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি (Community Health Hygiene) বা জনস্বাস্থ্য :

সমাজ জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ব্যক্তি এবং সমাজ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, একে অন্যের পরিপূরক। সমাজে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই অন্যজনকে প্রভাবিত করে আবার প্রতিটি ব্যক্তিই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে যেমন ব্যক্তিগত প্রভাব দেখা যায় তেমনি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমাজকে যেমন প্রভাবিত করে অর্থাৎ ব্যক্তি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে তেমনি সমাজও ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ গোষ্ঠী ব্যক্তিজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এই নিয়ম স্বাস্থ্য রক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিটি সমাজ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমাজজীবনের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে, যেহেতু ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। সুতরাং স্বাভাবিক কারণের সমাজের প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমাজ জীবনের স্বাস্থ্যে প্রতিফলিত হয়। আবার সমাজ জীবনের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন শুধু ব্যক্তিকে ঘিরেই নয় সমাজ জীবনকে ঘিরেও। এই কারণেই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন একসঙ্গে ভাবনার বিষয়। ব্যক্তির মত সমাজও তার নিজের প্রয়োজনে, নিজের তাগিয়েই স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বকে গ্রহণ করেছে। সমাজ জীবনের এই স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বই সামাজিক স্বাস্থ্যবিধিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। ডাঃ বি. এন ঘোষ এর মতে, "when the different measures are applied for the well-being of the community as a whole in an organised manner it is known as public Health or Community hygine." অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে যখন সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাগুলিকে সুসরঞ্জিত ভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে বলা হয় সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি। আবার অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে WHO বলেছেন, "Public Health is the science and the art of preventing disease, prolonging life, and improving health and efficiency, through organised effort."

সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত উপরোক্ত ধারণা থেকে বলা যায় এর উদ্দেশ্য হল সামাজিক কল্যাণ। এর থেকে আমরা কতকগুলি মূল উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারি। সেগুলি হল—

১) সমাজ জীবনের অন্তর্গত কোন একজন ব্যক্তির অসর্তকতার জন্য যেন সমাজের অন্যান্য বেশীর ভাগ ব্যক্তিকে তার কু-ফল ভোগ করতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। সমাজ অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে জীবনযাপন করতে অভ্যস্থ হয় তার ব্যবস্থা করা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য।

২) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিগুলির উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির আর একটি উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক নাগরিককে স্বাস্থ্য সম্পর্কে উপযুক্ত এবং সর্বাধুনিক তথ্য সরবরাহ করা এবং সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

৪) বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রবর্তন করাও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য। সমাজ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানুষের রোগমুক্তি প্রসঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫) সমাজ জীবনে যে ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা হয়, খাদ্য প্রস্তুত করা হয় সেগুলির স্বাস্থ্যসম্মত গুণমান এবং পুষ্টিমূল্য সম্পর্কে বিবেচনা করা আর একটি উদ্দেশ্য। পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করা এই বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি মেনে চলা দরকার।

১) সমাজ জীবনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত দূষণমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

২) স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর খাদ্যবস্তু বিক্রয়, ভেজাল যুক্ত খাদ্য সন্ধান ও তার বিক্রয় রোধ এবং অপরাধী বিক্রেতাদের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩) মল-মূত্র ত্যাগের স্থানকে এবং আবর্জনাযুক্ত স্থানকে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

৪) প্রতিটি বসবাসের গৃহ যাতে আলো বাতাস যুক্ত হয়, পরিচ্ছন্ন থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৫) বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্যর পরীক্ষা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬) সমাজ অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

৭) জনস্বাস্থ্যে বিভাগ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে একত্রে সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির কার্য সম্পন্ন করা যায়।

৮) জনস্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যবিধিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রাচীর পত্র (Poster), বিজ্ঞপ্তি (Handbill) প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেই প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে তথ্য চিত্র প্রদর্শন করানো উচিত।

৯) সংক্রামক রোগ সম্পর্কে জনসচেতন বৃদ্ধি করা, রোগ নিরাময়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০) জনস্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে দায়িত্ব প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ বিভাগের কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-৬ (Check your progress-6)

নির্দেশ . . . . . .

ক) স্বাস্থ্য শিক্ষার সংজ্ঞা দিন।

খ) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

গ) শিশুকে কেন দাঁতের যত্ন নেওয়া শেখানো দরকার?

৭.৪ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শন

শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এই পরিদর্শন প্রক্রিয়াটি বিষয়টিকে দু'টি দিক থেকে দেখা যেতে পারে—

ক) শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা দৈনন্দিন স্বাস্থ্য পরিদর্শন

খ) চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরিদর্শন।

ক) শিক্ষক/শিক্ষিকা কতৃক স্বাস্থ্য পরিদর্শন : প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খুব কাছের মানুষ হলেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের দৈনিক তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চোখ, কান, দাঁত, হাত ও পায়ের নখ স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন। লেখা-পড়ার সামগ্রী ওসেই সঙ্গে খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তির কিছু ত্রুটি আছে কিনা তা খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন। দাঁত ও মাড়ির কোন রোগাক্রমন কিংবা খোস-পাঁচড়া, দাদ জাতীয় কোন চর্মরোগে শিক্ষার্থীদের আক্রান্ত হওয়ার কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা তাও দেখা দরকার। এই সমস্ত চর্মরোগের কোন সন্ধান পেলে শিক্ষার্থীদের যেমন সাবধান করে দেবেন তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত না হয়।

এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে যেগুলি তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী সংক্রামক। সেই সব সংক্রমক রোগে যাতে কোন শিক্ষার্থী আক্রান্ত না হয় তা যেমন দেখা দরকার তেমনি যদি আক্রান্ত কোন শিক্ষার্থীর সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় কতৃপক্ষের নজরে এনে সংবেদনশীল মন নিয়ে, তার রোগমুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের সংক্রমক রোগের মধ্যে আছে— হাম, বসন্ত, মাম্পস, ডিপথেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি ইত্যাদি। রোগের লক্ষণ অনুসারে এইসব রোগাক্রান্ত শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে

চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন দরকার তেমনি যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত না হয় সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্যতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়, মনমরা নিরানন্দ ভাব, হিংসা, উগ্রতা ও মানসিক উত্তেজনার মত অসুস্থ মানসিকতা দেখা যায়। শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের এই সমস্ত মানসিক অসুস্থতার লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। এর ভিত্তিতে তা প্রতিকারের ব্যবস্থাও নিতে হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৬ (Check your progress-6)

নির্দেশ . . . . . .

ক) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার দুটি দিক কি কি?

খ) শিক্ষক/শিক্ষিকা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করবেন?

৭.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক জীবন কিভাবে সুস্থ্যতার সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক ক্ষমতাকে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে পারে সেই শিক্ষাই হল স্বাস্থ্যশিক্ষা।

প্রাক প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সে শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত এটাই ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি।

শিশুর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। এগুলি হল : স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্যবিধিতে উৎসাহ প্রদান, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, অভিযোজনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির মূলনীতিগুলি মেনে চলা এবং শিশুকে শেখানো জরুরী। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এই নীতিগুলির মধ্যে প্রধান হল : স্বাস্থ্যরক্ষা ও খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত অভ্যাস, বিশ্রাম ও ঘুম সংক্রান্ত অভ্যাস, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত অভ্যাস ইত্যাদি অত্যন্ত দরকারী। ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে ত্বকের, চুলের, দাঁতের, কানের, চোখের, নাকের, নখের এবং পায়ের যত্ন নেওয়া, নিয়মিত শরীর চর্চা করা, জল পান ও মলমূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি। এর সঙ্গে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করাও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিশুকে কেবল নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা শেখালেই চলবে না এর সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক সমাজের কথাও ধীরে ধীরে ভাবাতে হবে। কারণ পরিবেশ দূষিত হলে, পাড়ায় সংক্রামক অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব হলে তা ধীরে ধীরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এর জন্যও কতগুলি নীতি মেনে চলতে শিশুকে শেখাতে হবে।

সবশেষে এর প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পিতা-মাতার থেকে কম নয়। এর জন্য বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা জরুরী। এর ফলে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশু নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিতে শিখবে এবং ধীরে ধীরে তা অভ্যাসে পরিণত করবে।

৭.৬ অনুশীলনী (Exercise)

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কাকে বলে?

(ii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির প্রধান দিকগুলি কি কি?

(iii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির যে কোন তিনটি মূল নীতি উল্লেখ করুন।

(iv) মানষিক স্বাস্থ্য কাকে বলে?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি?

(ii) নখের যত্ন নেওয়া জরুরী কেন?

(iii) জন পান এবং মলমূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে শিশুকে কিভাবে অভ্যাস করাতে হবে?

(iv) শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করা কেন দরকার?

গ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখুন :

(i) প্রাক-প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(ii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধির উদ্দেশযগুলি আলোচনা করুন।

(iii) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি শিশুকে শেখানো দরকার কেন?

(iv) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে পূরণ করা যাবে?

৭.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৬ এবং ৭ এর উত্তর সংকেত

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-৬

(ক) স্বাস্থ্যর রীতি-নীতি সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞান।

(খ) স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং স্বাস্থ্যবিধিতে উৎসাহ প্রদান

(গ) দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা বার না করলে পচে গিয়ে রোগ জীবানু জন্মায়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর সংকেত-৭

(ক) i. শিক্ষক/শিক্ষিকার দ্বারা দৈনন্দিন স্বাস্থ্য পরিদর্শন এবং

ii. চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরিদর্শন।

(খ) মানসিক অসুস্থতার লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন এবংতার প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবেন।

পুস্তক তালিকা

১। মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু, (২০০৭), প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব, কলকাতা : সেন্টাল পাবলিকশিং কনসার্ন

২। চৌধুরী অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস, ঘোষ শান্তনু (২০০৯), সাম্প্রতিক সমাজতত্তব কলকাতা : চ্যাটার্জি পাবলিশার্স

৩। চট্টোপাধ্যায় অমিয় কুমার (১৯৭৮), কোষতত্তব ও জীবতত্ত্ব, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ

৪। ভট্টাচার্য শ্রীনিবাস (১৯৮২), শিক্ষাবিজ্ঞান, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ

৫। বর্দ্ধন, অসীম (১৯৮৯), শিশু কেন শিশু, কলকাতা : প: ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৬। সেন, জ্যোতির্ময় (২০০৪), সমাজ ভূগোলের রূপরেখা, কল্যাণী পাবলিশার্স

৭। সরকার, আর. এম. (২০১১), জৈবিক নৃবিজ্ঞান, কলকাতা : নলেজ হাউস

৮। সরকার, আর. এম. (২০১২), প্রাযোগিক নৃবিজ্ঞান, কলকাতা : নলেজ হাউস

৯। সরকার, আর. এম. (. . . .), সামাজিক সংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান

১০। চট্টোপাধ্যায়, অনীশ (২০০৫), পরিবেশ, কলকাতা : টি. ডি. পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ

১১। সেন, জ্যোতির্ময় (২০১০), জনবসিত ভূগোল, কলকাতা : প: ব: রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ

১২। মাইতি, চঞ্চল কুমার (২০১২), শারীরশিক্ষার সহপাঠ, কলকাতা : ক্লাসিক বুক্স

১৩। লাহিড়ী-দত্ত, কুণ্ডলা, দে বাসুদেব (২০০৬), পরিবেশ সমীক্ষণ, কলকাতা : দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাঃ লিঃ

১৪। গুহ, সুহিতা (১৯৯৪), জীন, বংশধরা ও বিবর্তন (১ম খণ্ড) কলকাতা : পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

১৫। মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় (২০১২), ভূগোলদর্শন, কলকাতা : মিত্রম্

১৬। রায়, সুশীল (২০০৮), শিক্ষামনোবিদ্যা, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

১৭। বসু, অমরেন্দ্র নাথ (১৯৯৫), শিশুমনের বিকাশ ও বিকার, কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

১৮। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু (১৯৯০), সমাজ মনোবিজ্ঞান, কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স

১৯। রায়, সুশীল (২০০৫-০৭), শিক্ষাতন্ত্র, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

২০। হালদার, গৌরদাস ও শর্মা প্রশান্ত কুমার (২০০০), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষানীতি কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স

২১। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু ও শর্মা, প্রশান্ত কুমার (১৯৯৮), শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স

২২। Panda, K.C. (2012), Elements of Child Development, Kolkata; Kalyani Publishers

২৩। Dutta, Sukanya. (2003) Social Life of Animals, New Delhi National Book Trust of India.

২৪। Aggarwal, J.C. (2008) Educational Reforms in India, Delhi : Shipra Publications

২৫। Smith, E. Edward : Kosslyn, M. Stephen. (2011) Cognitive Psychology Mind and Brain, New Delhi : PHI Learning Private Limited

মূল্যায়ণ

১। রায় সুশীল (২০০৫) মূল্যায়ণ নীতি ও কৌশল, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

২। রায় সুশীল (২০০৪) শিক্ষানীতি, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

৩। চক্রবর্তী অনুরুদ্ধ, ইসলাম মহ: নিশাইরুল (২০১১) শিক্ষক শিক্ষণ, মূল্যায়ণ, কলকাতা : ক্লাসিক বুকস্

৪। ঘোষ, রণজিৎ (১৯৯৮), শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

৫। শর্মা, প্রশান্ত কুমার (২০০২), শিক্ষায় মূল্যায়ণ ও নির্দেশনা, কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স